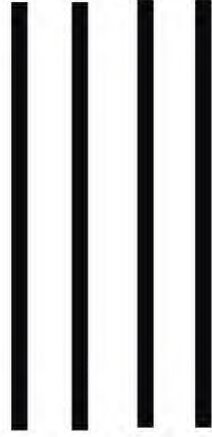


বেদ কি আল্লাহর বানী ?

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

বেদ কি আল্লাহর বানী ?



মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফাস্ট ক্লাস), বি.এড., মহষী দয়ানন্দ
ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

ঃ প্রকাশনায় ঃঃ
আইডিয়া প্রকাশনী

বেদ কি আল্লাহর বানী ? - মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম



Ved Ki Allahr Bani (Are the Ved is word of Allah ?) Written by Muhammad Abdul Alim

ঃপ্রকাশনায় ঃ

আইডিয়া প্রকাশনী

প্রকাশক

মুহাম্মাদ আশিক ইকবাল,

ময়ূরেশ্বর, বীরভূম,

মোবাইল : +৯১ ৯১৫৩০০৭৪১৬

+৯১ ৭৫০১৮৭৯৬৬৮

ই-মেইল : www.iqubal@gmail.com

উৎসর্গ

হযরত মাওলানা মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) ঐর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র
পুস্তকটি উৎসর্গ করলাম যিনি বেশ কয়েকবার আর্থ সমাজের পণ্ডিত
স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে মুনাযারায় চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন ।

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ১ নভেম্বর ২০১৪

First Print : 1st November 2014

মূল্য : ৩০ /- (ত্রিশ টাকা মাত্র)

Ved Ki Allahr Bani ? (Are the Ved word of Allah ?)

Written by Muhammad Abdul Alim. 1st Edition 1st November 2014

**Published By Idea Publication, Mayureswar, Birbhum, West Bengal,
India, Price Rs : 30/- (Thirty Rupise Only)**



সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

১) ভূমিকা-----	৫
২) বেদ নামক ধর্ম গ্রন্থটি ইংরেজদের রচনা (একজন হিন্দু ঐতিহাসিকের গবেষণা)-----	৮
৩) পর্যালোচনা-----	১২
৪) চক্রান্তগারগুলি কোথায় ছিল ?-----	২২
৫) সংস্কৃত ভাষাও ইংরেজদের চক্রান্তে সৃষ্টি-----	২৫
৬) দেবতাদের কুকর্ম-----	২৭
৭) শ্রীকৃষ্ণের কুকর্ম-----	৩০
৮) দেবরাজ ইন্দ্রের কুকর্ম-----	৩১
৯) ব্রহ্মার কুকর্ম-----	৩২
১০) কার্তিকের জন্ম রহস্য-----	৩৩
১১) বিবাহ ও হিন্দু ধর্ম-----	৩৩
১২) হিন্দু মন্দিরগুলিতে জঘন্য কুকর্ম-----	৩৫
১৩) হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান বিরোধী কথা-----	৩৯
১৪) ‘মনুসংহিতা’ যা আছে-----	৪৪
১৫) রামায়নের প্রতি এক কলম-----	৫০
১৬) শঙ্করাচার্য একেশ্বরবাদ কোথা থেকে পেলেন ?-----	৫১
১৭) বেদ কি প্রথম আসমানী গ্রন্থ ?-----	৫২
১৮) একটি অভিযোগের জবাব-----	৫৬
১৯) পরিশিষ্ট-----	৫৭
২০) মহেন্দ্রপাল আর্যের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ-----	৫৮
২১) লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী-----	৫৯



ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রসংশা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা প্রতি পালক এবং একমাত্র উপাস্য । তাঁর প্রিয় হাবীব তাজদারে মদীনা আহমদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইদুল মুরসালিন, সাফিউল মুজনাবিন ।

সত্যকে প্রকাশ করা কোনদিন ধর্মবিরোধী কাজ নয় । আর স্বধর্ম ছাড়া যুক্তির আলোকে অন্য ধর্মের সমালোচনা কারীকে কোনদিন পরধর্ম বিদ্রোহী বলা যায় না । এই পুস্তকে আমি হিন্দু সনাতন বৈদিক ধর্মের প্রাণ খুলে সমালোচনা করেছি তার মানে এই নই যে আমি হিন্দুবিদ্রোহী । আমার মনে হিন্দু ধর্মের প্রতি যথেষ্ট সহিষ্ণুতা আছে । আমি হিন্দুবিদ্রোহী নই । আমি আমার দেশের ও বিশ্বের যে কোন হিন্দুকে আমি ভাই বলে মনে করি কারি কারণ আমার ইসলাম ধর্ম পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়েছে । অন্য ধর্মকে গালিগালাজ করার অধিকার দেয়নি । সেজন্য আমি আমার হিন্দু ভাইদের বলব আপনারা যেন আমাকে হিন্দুবিদ্রোহী না ভাবেন ।

পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম বর্তমানে রয়েছে হিন্দুধর্ম তার মধ্যে অন্যতম । হিন্দুভায়েদের বিশ্বাস যে পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুধর্মগ্রন্থ বেদই সত্য আর বাকি ধর্মগ্রন্থগুলি মানুষের তৈরী করা । প্রকৃতপক্ষে তা নয় । পৃথিবীতে একমাত্র কুরআন শরীফ ছাড়া কোনগ্রন্থই সত্য নয় । আর হিন্দু সনাতন বৈদিক ধর্মগ্রন্থ বেদ কোন ধর্মগ্রন্থই নয় । যা এই পুস্তক পড়লে বুঝতে পারবেন ।

হিন্দুধর্মগ্রন্থগুলি রচনাকাল সম্পর্কে আমরা যা যেনেছি,
বেদ রচনা হয়েছে : ১২০০ খ্রীষ্টপূর্ব ।
উপনিষদ রচনা হয়েছে : ৭০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ।
মহাভারত রচনা হয়েছে : ৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ।
রামায়ন রচনা হয়েছে : ২০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ।
মনুসংহিতা রচনা হয়েছে : ২০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ।
শ্রীমদ্ভাগবতগীতা রচনা হয়েছে : ২০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ।
পুরান রচনা হয়েছে : ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ।



সুতরাং হিন্দু ধর্মের বয়স ৩০০০ হাজার বছরের মতো । আর ইসলাম সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান । সর্বপ্রথম নবী হলেন হযরত আদম (আঃ) ও সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) । অতএব ইসলাম ছাড়া কোন ধর্মই সত্য নয় এবং কুরআন শরীফ ছাড়া কোন ধর্মগ্রন্থই ঐশ্বরিক বা ইলহামী গ্রন্থ নয় ।

তবে সত্য কোনদিন মানুষ সহজে মেনে নেয়না । যে হিন্দুধর্মের মধ্যে এত ঘোঁটোলা বিদ্যমান সেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা আজ ইসলামকে চ্যালেঞ্জ করেছে যে কুরআন কোন ঐশ্বরিক বা ইলহামী গ্রন্থ নয় । এই চ্যালেঞ্জকারীদের মধ্যে একজন হলেন আর্থসমাজের পণ্ডিত মহেন্দ্রপাল আর্থ । তার দাবী কুরআন শরীফ ঐশ্বরিক গ্রন্থ নয় । সে চ্যালেঞ্জ করেছে কেউ যদি কুরআনকে আল্লাহর বানী বলে প্রমাণ করে দিতে পারলে সে নাকি তার দলবল নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নেবে । এমনকি সে আমাকেও (এই পুস্তকের লেখক আব্দুল আলিম) ইন্টারনেটে চ্যালেঞ্জ করেছে কুরআন শরীফ নিয়ে মুনাযারা (Debate) করার জন্য । আমি তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি । কিন্তু সে আর আসেনি । আর কিয়ামত পর্যন্ত আসতেও পারবে না । কারণ সে জানে নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এই জুতোর গোলাম এবং মহান আল্লাহ পাকের বান্দা এই মুসলমান জাতির সঙ্গে দলীল প্রমাণ নিয়ে বিতর্কের ময়দানে ফাতাহ (বিজয়) অর্জন করা মুশকিল নয় বরং অসম্ভব ব্যাপার । যদি তার বিশ্বাস না হয় তাহলে একবার সে মুনাযারার (বিতর্কের) ময়দান সাজাক তো বুঝতে পারবে । পৃথিবীতে কোন কাফিরের মা এমন কোন সম্ভান জন্ম দেয়নি যে তারা বিতর্কের ময়দানে আমাদেরকে পরাস্ত করে দেবে ।

যতবার আর্থসমাজের কোন পণ্ডিতের সঙ্গে আমাদের বিতর্ক হয়েছে কোনবারই তারা আমাদেরকে পরাজিত করতে পারেনি । প্রতিবার তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে । এই অভিশপ্ত আর্থ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বেশ কয়েকবার বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা কাসিমুল উলুম ওয়াল খায়রাত হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহঃ) এর সঙ্গে বিতর্ক করতে এসে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছে । আর কিয়ামত পর্যন্ত তারা জয়ী হতে পারবে না ইনশাআল্লাহ ।

মহেন্দ্রপাল আর্থ দেখুক যে বেদকে এবং হিন্দুধর্মগ্রন্থগুলিকে সে অশ্রুত এবং ঐশ্বরিক মনে করেছে সেই ধর্মগ্রন্থগুলির কি অবস্থা । এই পুস্তকে আমি প্রমাণ করেছি সনাতন বৈদিক হিন্দু ধর্ম কোন ধর্মই নয় এবং বেদ সহ কোন হিন্দু গ্রন্থ ঐশ্বরিক বানী নয় ।

পাঠকদের বলি, মানুষ মাত্রই ভুল হয় । তাই এই পুস্তকের মধ্যে কোন ভুল ভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়ে আমাকে জানাবেন পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন



করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ । পরিশেষে পাঠকদের জানাই আপনারা দোওয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের ইমান বৃদ্ধি করে দেন এবং খতিমা বিল খাইর দান করুন । (গ্রন্থকার)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

গ্রাম :- শালজোড়, পো :- লোকপুর

থানা :- খয়রাসোল, জেলা:- বীরভূম

পশ্চিম বঙ্গ, ভারত

মোবাইল-+৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১/

+৯১ ৮৯২৬১৯৯৪১০

E-Mail - md.abdulalim1988@gmail.com



বেদ নামক ধর্ম গ্রন্থটি ইংরেজদের রচনা (একজন হিন্দু ঐতিহাসিকের গবেষণা)

হিন্দু পণ্ডিত ‘প্রাচীন যুগের ইতিহাস লেখার নেপথ্য কথা’ নামে একখানি মূল্যবান গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। লিখেছেন লেখক শ্রী. বি. আর্থ। আর প্রকাশ করেছেন শ্রীমতি শোভা চট্টোপাধ্যায়। সেখানে লেখক শ্রী. বি. আর্থ লিখেছেন, “প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে নাকি ঐ বেদ ‘রচিত’ হয়েছিল। আর তার শ-পাঁচেক বছর পর নাকি ঐ উপনিষদ। সূত্র স্মৃতি পুরাণ নাকি ‘রচিত’ হয়েছিল এর পরে কয়েকশো বছর ধরে। ‘রচিত’ শব্দটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। যে যুগে ঐ বেদ-উপনিষদ ‘রচিত’ হয়েছিল বলে প্রচার করা হয় সে যুগে লেখার রেওয়াজই ছিল না।.....এবং লিপির জন্ম হয়নি বলেই তখন সবকিছু ‘রচিত’ হত-লিখিত হত না। সবকিছুই মুখে মুখে চলত। এই আজগুবি তথ্যের একটা সুন্দর নাম দেওয়া হয়েছে-শ্রুতিপরম্পরা। শ্রুতিপরম্পরাতেই নাকি বেদ-উপনিষদ বেঁচে থাকত।.....ভারতের প্রায় তাবৎ পণ্ডিত এই জলজ্যান্ত মিথ্যা বিশ্বাস করে নিয়েছেন।.....ভারতের পণ্ডিতেরা শুধু তথ্যটি বিশ্বাস করেই ক্ষান্ত হন নি, এ দুই গ্রন্থাবলীর উপর ভিত্তি করে নানা তত্ত্বও তৈরী করে নিয়েছেন। রাজ্যের থিসিস তৈরী হয়েছে। ডক্টরেট পেতেও অসুবিধা হয়নি। দরাজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁদের পাণ্ডিত্যের। মূলেই যে ফাঁকি এইটাই তাঁরা ধরতে পারেননি।”

শ্রী. বি. আর্থ আরও লিখেছেন, “এক, ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ আঁকেতি দুপের ভারতে এসেছিলেন ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে। আট বছর তিনি এদেশে ছিলেন। ঐ ক বছরে সংস্কৃত এবং ‘আবেস্তার ভাষা’ দু-দুটো ভাষা শিখে নিয়ে তিনি ইউরোপ ফিরে গিয়েছিলেন ১৭৬২ তে। ফেরার সময় বেশকিছু ফারসী পুঁথি তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। উপনিষদের ফারসী অনুবাদের সেইসব পুঁথি থেকে ল্যাটিন অনুবাদ করার কাজ তিনি শুরু করলেন ওখানে গিয়েই। উপনিষদের দুরকম ফারসী অনুবাদ থেকে তুলনামূলক সুস্পষ্টবিচার সেরে ১৮০১ [১৮০২] সালে উপনিষদগুলোর ল্যাটিন অনুবাদের কাজটা শেষ হল। অনুবাদটির ল্যাটিন নাম তিনি রাখলেন Oupnik’ hat নিঃসন্দেহে বিচিত্র বানান। দুই, কঠোপনিষদের ফারসী অনুবাদ থেকে রামমোহন রায় ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮১৭ সালে আর ইংরেজী অনুবাদটা ১৮১৯ সালে। এছাড়া বাংলায় আরও পাঁচটি উপনিষদের অনুবাদ তিনি করেছিলেন। [কেন, ঈশ, মাণ্ডুক্য, শ্বেতশ্বতর ও মুণ্ডক] হিন্দিত চারটি উপনিষদের অনুবাদও তিনিই করেছিলেন।”



এর পর্যালোচনা করতে গিয়ে শ্রী. বি. আর্থ বাবু লিখেছেন, “এক, সংস্কৃত উপনিষদ যদি থেকেই থাকবে তবে তার অনুবাদের অনুবাদ করার দরকার পড়ল কেন ? সোজাসুজি সংস্কৃত বই থেকে অনুবাদ করার কি কিছু অসুবিধা ছিল ? [রামমোহন রায় ভাল সংস্কৃত জানতেন। দুই, তবে কি সংস্কৃত নামক বইয়ের অস্তিত্বই ছিল না ? তবে কি অস্তিত্বহীন সেই সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর ফারসী সংস্করণটা আসলে একটা তৈরী করা (manufactured) বই ? তিন, সাহেব পণ্ডিতের নির্দেশে লেখা একটা মতলবের নামই কি ঐ ফারসী উপনিষদ ?.....দুপৈর সাহেব শিখেছেন ‘আবেস্তার ভাষা’ আর তর্জমা করে বসলেন ফারসী ভাষা থেকে । এটা কি করে সম্ভব হল ? অধুনিক ফারসীভাষা শিখলেন কি করে ? আর যদি মনে করে নেওয়া যায় উপনিষদগুলো ‘আবেস্তার ভাষা’-য় লেখা হয়েছিল তাহলেও ত আর এক প্রশ্ন আসছে । রামমোহন রায়ই বা তর্জমা করলেন কি করে ? তিনি ত আধুনিক ফারসী ভাষাটাই জানতেন-‘আবেস্তার ভাষা’-টা নয় ।

প্রশ্ন আরও আসছে । যে সংস্কৃত উপনিষদ গ্রন্থাবলীকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত মূল্যবান মনে করে বসলেন-যে উপনিষদের ল্যাটিন অনুবাদ করার কাজে দীর্ঘ ৪০ বৎসর তাঁরা কাটিয়ে দিলেন-সেই সংস্কৃত উপনিষদ ঐ ৪০ বছরের মধ্যে ভারতে প্রকাশ করা হল কেন ? সংস্কৃত বইয়ের সন্ধান নেই-তার ল্যাটিন তর্জমা করারই বা এত দরকার পড়ল কেন ? ল্যাটিন ভাষাটা কি দুনিয়ার ‘ধার্মিকজালিয়াতি’ পুষে রাখার মাধ্যম ? তবে কি ঐ তর্জমা করার ব্যাপারটাই একটা ভাঁওতা ? তবে কি ঐ চল্লিশ বছর ধরে সংস্কৃত উপনিষদগুলো ভারতে কোথাও লেখানো হচ্ছিল ? ”

শ্রী আর্থ বাবু আরও লিখেছেন, “শাহজাহানের পুত্র দারাশিকোহ কাশ্মীরে গিয়েছিলেন ১৬৪০ সালে । ওখানে থাকার সময় সংস্কৃত ভাষায় লেখা উপনিষদ গ্রন্থাবলী নাকি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । বইটির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে কিনা জানিনা তিনি নতুন উদ্যমে বইটির আর এক প্রস্থ তর্জমা করার ব্যবস্থা করে বসলেন । মতান্তরে মহাপণ্ডিত দারাশিকোহ নিজেই নাকি ঐ অনুবাদটা করেছিলেন ।.....তবে এইটুকু বলতে পারি উপনিষদের তর্জমা করার অপরাধের গল্পটা আরোপ করার ব্যবস্থা হয়েছিল পরিকল্পিত ভাবেই । ব্যবস্থা হয়েছিল কারণ মধ্যযুগেও অনেকে ‘উপনিষদ’-এর চর্চা করতেন-এই বানানো গল্পটাকে প্রমাণসিদ্ধ করার তাগিদ ঐতিহাসিকরা বোধ করেছিলেন ।.....ঐ ফারসী তর্জমা করার সময় কি ঐ উপনিষদ গ্রন্থাবলীটা হারিয়ে গিয়েছিল ? আর হারিয়েই যদি না যাবে তবে ফারসী ভাষা থেকে অনুবাদ করার দরকারই বা পড়ল কেন ? সংস্কৃত গ্রন্থাবলীটা গেল কোথায় ?”

এরপর সিদ্ধান্ত দিতে গিয়ে শ্রী আর্থ বাবু লিখেছেন, “যে বই কস্মিনকালেও ভারতে ছিল না-যে বইয়ের মূল্যবান (?) তত্ত্ব কস্মিন কালেও ভারতে আলোচিত হতনা-সেই বই প্রচারের ঠেলায় হয়ে দাঁড়াল হিন্দুদের মহান ধর্মগ্রন্থ।”

শ্রী আর্থ ইংরেজদের দ্বারা সৃষ্ট হিন্দু ধর্মগ্রন্থের চক্রান্তের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন,

“তথাকথিত ব্রহ্মের স্বরূপ রামমোহনের না জানার কথা নয়। তিনি সবই বুঝেছিলেন। সংস্কৃত বইয়ের পাতা নেই-তস্য ফারসী অনুবাদের বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি পুরো ব্যাপারটাই অনুমান করে নিয়েছিলেন। জালিয়াতি উদ্যোগের শরিক হয়েছিলেন স্বজ্ঞানেই। ইন্দো ব্রিটিশ ইনটেলেকচুয়াল ষড়যন্ত্রের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। ইংলন্ডের ওরিয়েন্টালিষ্ট চক্রের ক্রীড়ানক রামমোহন নিজে উপনিষদের অনুবাদ করেও বলতে পেরেছিলেন সে সাধারণ মানুষের জন্য নয়.....রামমোহনের যুগেই আবার ইংলন্ডের অ্যাংলিসিস্ট গোষ্ঠী সাময়িকভাবে তৎপর হয়েছিলেন। ওরিয়েন্টালিষ্ট চক্রের নেপথ্য কর্মকাণ্ড চলতে থাকলেও বাহ্যতঃ ঐ অ্যাংলিসিস্টদের প্রতিপত্তি বেড়ে গিয়েছিল।”

ইংরেজদের দ্বারা সৃষ্ট বেদের রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রী আর্থ বাবু লিখেছেন, “বেদ নামের কোন ধর্মগ্রন্থ যে ভারতে ছিল এতথ্য কেউ জানতেন না। আর ঐ ধর্মগ্রন্থে কি ছিল আর কি ছিল না-এটা জানার প্রশ্নও ছিল অবাস্তব। বেদের পুঁথি কেউই দেখেন নি। ব্রিটিশেরা আসার বেশ কিছু পরে বেদ নামটার প্রচার শুরু হয়।.....১৭৮৬ সালের আগে ঐ ‘আর্থভাষা’ বা ‘আর্থজাতি’র ধারণার জন্মই হয় নি।.....অস্তিত্বহীন পুঁথির ওপরও যে গবেষণা করা যায় এবং সে গবেষণার সঙ্গে জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের ডাকসাইটে সব পণ্ডিতও যে জড়িত থাকতে পারেন এটা ভাবতেও অবাক লাগে।.....বুঝতে কষ্ট হয় না একটা আন্তর্জাতিক সুসংহত এবং সুসংগঠিত চক্রান্ত ঐ কর্মকাণ্ডের পিছনে কাজ করছিল।.....বেদ সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীন এবং ‘প্রামাণ্য’ যে লেখাটা পাচ্ছি সেটা ছাপা হয়েছিল ১৮০৫ সালে। ‘এশিয়াটিক রিসার্চেস’ পত্রিকার অষ্টম খণ্ডে একটি প্রবন্ধ আকারে সেটা ছাপা হয়েছিল। লেখক ছিলেন কোলব্রুক। প্রবন্ধের নাম ছিল On the Vedas or Sacred Writings of the Hindus। or শব্দটা তাৎপর্যপূর্ণ। বেদ ‘অর্থাৎ হিন্দুদের পবিত্র রচনা’। বোঝা যাচ্ছে ‘বেদ’ নামক শব্দের অর্থটাও তখনও পর্যন্ত স্থিরকৃত হয় নি। হয়ে থাকলে ঐ or শব্দটা ওখানে বসতোনা।.....কোলব্রুক ঐ নমুনা প্রকাশের দীর্ঘ তেরিশ বছর পরে ১৮৩৮ সালে ‘ঋক’ বেদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। সংস্কৃত নয়, ল্যাটিনে। তাও ভারতে নয় সুদূর লন্ডনে। সেই খণ্ডটিতে ছিল ঋগ্বেদের ঐ অংশের ল্যাটিন অনুবাদ এবং সেই অনুবাদের ওপরে লেখা অসম্পূর্ণ কিছু ল্যাটিন টীকা। বইটা সম্পাদনা করেছিলেন ফরাসী পণ্ডিতের সম্পাদিত বই ছাপা হল ইংল্যান্ডে [উৎস-নীরদ. সি. চৌধুরী the Scholar



Extraordinary].....রোব্যাঁর সম্পাদিত ঋগ্বেদের ঐ বই আর বিবলিওথেক নাশিওনালে রক্ষিত বলে প্রচারিত বেদের পাণ্ডুলিপির [বলাবাহুল্য অস্তিত্বহীন] ওপর নির্ভর করে ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ বুর্নু বেদ সম্পর্কে কিছু গবেষণা করে নিলেন। বক্তৃতাও করে বেড়ালেন। তবে ঐ পর্যন্তই। বিরাট আকৃতির কোন লেখা তিনি প্রকাশ করেন নি। ঋগ্বেদের প্রথম ইংরেজী অনুবাদ করেন H. H Wilson। বইটা প্রকাশিত হয় লন্ডন থেকে ১৮৫০ সালে। রিচার্ড রাইটসনের The Sacred Literature of the Hindus ডাবলিন থেকে প্রকাশিত ১৮৫৯ সালে। থিওডোর বোনফে ‘সাম’ বেদের জার্মান অনুবাদ করেন ১৮৪৮ সালে। ভেবার যজুর্বেদের জার্মান অনুবাদ করেন ১৮৫২ সালে। সে যাইহোক ঐ সময়েই বেদের সবসময়ে বড় বোদ্ধা ম্যাক্সমুলারের প্রয়াস যুক্ত হল বেদ ঘটিত কর্মকাণ্ডে। ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হোল ১৮৪৯ সালে।.....ছ খণ্ডে সমাপ্ত ঐ ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হোল ১৮৭৫ সালে। জার্মান ঋগ্বেদ আলফ্রেড লুডভিগ-এর সম্পাদনায় পূর্ণতঃ প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। ফরাসী ভাষায় অনূদিত লালোয়া সম্পাদিত ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। সিদ্ধান্ত নিতেই হয় ১৮৭০ সালের আগে কোন ভাষাতেই ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হয় নি।.....বেদের বৈদিক বয়ান কেউ দেখলেন না আর তার আগে তস্য ইংরাজী, ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মান অনুবাদের ব্যবস্থা হয়ে গেল। নিঃসন্দেহে মজার ব্যাপার।.....প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ ঐ কর্মকাণ্ডে অর্থের যোগান দিয়েছিলেন কে? দিয়েছিলেন ঐ ইন্সট ইন্ডিয়া কোম্পানী।.....কোম্পানীর বকলমে ব্রিটিশ সরকারই কি ঐসব খরচ করেছিলেন? একদিকে ভারত নামক ভূ খন্ডের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করার ব্যবস্থা আর অন্যদিকে তার অতীতকে উজ্জ্বল বানাবার খেলাই কি শুরু করেছিলেন মহানুভব ব্রিটিশ সরকার?”

লেখক শ্রী আর্থ বাবু আরও লিখেছেন, “বেদের পুঁথি হয়না। বেদের প্রাচীন পুঁথি থাকতেই পারে না।.....বেদ যাতে কোনওক্রমে লিপিবদ্ধ না হয় তারজন্য বিধান ছিল যাঁরা বেদ লিপিবদ্ধ করবেন তাঁরা নরকগামী হবেন। বেদবিক্রয়িনশ্চৈব বেদানাং চৈব লেখকাঃ/বেদানাং দূষকাশ্চৈব তৈতৈ নিরয়গামিনঃ।”

‘দ্য কালচারাল হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া’ গ্রন্থে লেখা আছে, “... Rg-veda, Converting 1028 hymns or about 10,560 mantras or about 74,000 words, there is only one variant reading, viz. its mamscatoh for mamscatoh in VII-44-3” এই ৭৪,০০০ শব্দযুক্ত বেদকে অক্ষরে অক্ষরে কিতাব যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস করতে গিয়ে শ্রী আর্থবাবু লিখেছেন, “এর বানানো গল্পটাকে সবাই বিশ্বাস করেন নি। করেন নি ডঃ হীরন্ময় বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও। ঋগ্বেদ সংহিতার ভূমিকার একজায়গায় তিনি লিখেছেন, ‘স্মরণশক্তির সাহায্যে ঋগ্বেদের মত একটি বিরাট গ্রন্থ বংশপরম্পরায় শত শত বছর ধরে যে অভ্রান্তভাবে রক্ষিত হতে পারে এটি কল্পনা করাই আমার ধারণায় যুক্তিসংগত

নয় । ঋগ্বেদে দশহাজারের মত ঋক আছে । এমন শ্রুতিধর ব্যক্তি কে আছেন যিনি তার সকল সূক্তগুলি অত্রান্তভাবে কণ্ঠস্থ করে রাখবেন ?’.....ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৫২ সূক্তের ৬ নং শ্লোকে পাচ্ছি : ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রান্যগ্নিঃ ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্ঘন্ । শত-সহস্রের ছড়াছড়ি বেদে আছে । আছে অযুত-নিযুত-অবুদও । গোলমাল যে এর সংখ্যাবাচক শব্দগুলোর মধ্যেই রয়েছে । শূন্য চিহ্নের আবিষ্কার কি তখন হয়েছিল ? লিপিবদ্ধ ছিল না-শূন্য চিহ্নটা থাকে কি করে ?”

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, “যীশুখ্রীষ্টের পর ১,০০০ বৎসর পর্যন্ত বেদটা মুখে মুখেই থাকিত । শুধু বেদ নয় তার সঙ্গে যত অঙ্গ, বেদাঙ্গ, যত বেদলক্ষণ সব মুখে মুখেই থাকিত । লিখিলে পাপ হইত । জৈন ও বৌদ্ধদেরও শব্দ মুখে মুখে থাকিত ।”

লেখক শ্রী আর্থ বাবু আরও লিখেছেন, “১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পুরাণের প্রকাশ শুরু হলেও সর্বশেষ ‘ভবিষ্য পুরাণ’ প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে । ‘কৃষ্ণ দৈপায়ন ব্যাস’-মহাশয়ের ছদ্মনামের আড়ালে কেশব সেনই ঐ পুরাণটি লিখেছিলেন । লিখেছিলেন বাইবেলের কায়দা চুরি করে ।”

পর্যালোচনা

লেখক শ্রী বি. আর্থ ‘প্রাচীন যুগের ইতিহাস লেখার নেপথ্য কথা’ বইটিতে যা লিখেছেন তার উপর ভিত্তি করে বলা যায় হিন্দু ধর্ম বা সনাতন বৈদিক ধর্মের পুরো সংস্কৃতি ইংরেজদের দ্বারা সৃষ্ট হয় । বেদ, পুরাণ, উপনিষদ যা কিছু আছে তা সব ইংরেজদের ষড়যন্ত্রেই সৃষ্ট হয় । একটু লক্ষ করলে দেখা যায় বেদের শ্লোক অক্ষরে অক্ষরে মুখস্ত রেখে বংশপরম্পরায় বাঁচিয়ে রাখার ধারণাটি ইসলাম থেকে চুরি করা । যেহেতু আমাদের মহানবী (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর মুসলমানরা কুরআন এবং হাদীস মুখস্ত করে কয়েক যুগ ধরে অবিকৃত অবস্থায় বাঁচিয়ে রেখেছেন । বর্তমানেও লক্ষ লক্ষ হাফিজ রয়েছেন যারা আল্লাহর বানী কুরআনকে মুখস্ত করে রেখেছেন । তবে কুরআন শরীফ হযরত উসমান গনী (রাঃ) এর জামানায় গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ করা হলেও হাদীস সে যুগে লিপিবদ্ধ ছিল না । ফলে কিছু কুচক্রী শিয়া ও মুনাফিকরা নবীর হাদীসকে বিকৃত করে এবং কিছু হাদীস নিজেরা তৈরী করে নবীর উপর আরোপ করে । ফলে ইসলামের মুহাদ্দীসরা হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে হাদীসের উপর বিষদ গবেষণা করে কিছু উসূল (মূলনীতি) নির্ধারণ করে দেন যার দ্বারা হাদীসের সহীহ, যঈফ, মওযু, নাসেক, মনসুখ, মরফু, মুনকাতি, মুরসাল, ইযতিরাব, রাবীর অবস্থা বোঝা যায় ।

সুতরাং দেখা যায় নবী (সাঃ) এর ইন্তকালের কয়েক যুগ অতিবাহিত হতে না হতেই হাদীসের উপর জালিয়াতি শুরু হয়ে যায় তাহলে বেদ রচিত হওয়ার পর ১,০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় টিকে রইল কি করে ? ইংরেজদের আজব ষড়যন্ত্র ।

এখানে হয়তো অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে রচিত হয় তাহলে সেখানে আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নাম কি করে রইল ? কি করে উক্ত গ্রন্থগুলিতে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবানী রয়েছে ? যেমন বেদে আছে,

‘নরাশংস প্রতিধামান্যজ্জন তিস্তো দিবঃ প্রতিমহু স্বচিঃ’

(ঋগ্বেদ সংহিতা ২/৩/২)

‘নরাশংস মিহাপ্রিয় মস্মিন্যজ্জ উপবয়ে মধুজিহু হবিকৃতম’

(ঋগ্বেদ সংহিতা)

অথর্ববেদে আছে, “লোকেরা শোন । নরাশংসকে (মুহাম্মাদ) লোকেদের মাঝে প্রেরণ করা হবে । সেই স্বদেশত্যাগীকে আমরা ৬০,০৯০ জন শত্রুর কাছ থেকে নিজের আশ্রয় গ্রহণ করব । তাঁর বাহন হবে উট । তাঁর সঙ্গে কুড়িটি উট থাকবে । আকাশকেউ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবনমিত করবে । সেই মহান ঋষিকে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা, দশটি গলার হার, ৩০০ ঘোড়া এবং ১০,০০০ গাভী দান করা হয়েছে ।” (২০-১২৭-১-২-৩)

এই নরাশংস কে তা প্রমান করতে গিয়ে পণ্ডিত বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় ‘নরাশংস আওর অন্তিম ঋষি’ নামক গ্রন্থে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কেই বলেছেন । তিনি প্রমান করেছেন, রূপক ভাষায় ১০০ স্বর্ণমুদ্রা মানে হল ১০০ জন আসহাবে সুফফা । ১০ গলার হার মানে হল দশ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি (আশারায় মুবশ্শারা) ৩০০ ঘোড়া বলতে বদর যুদ্ধের ৩১৩ জন যোদ্ধা বোঝানো হয়েছে । আর বাকি ১০,০০০ গাভী বলতে মক্কা বিজয়ের সময় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ১০,০০০ সঙ্গী যোদ্ধাকে বোঝানো হয়েছে ।

আর ‘নরাশংস’ মানে হল প্রশংসিত ব্যক্তি । অপরদিকে ‘মুহাম্মাদ’ মানেও হল প্রশংসিত ব্যক্তি । সুতরাং ‘নরাশংস’কে আরবীতে অনুবাদ করলেই হয় ‘মুহাম্মাদ’ ।

এই ‘নরাশংস’ শব্দটি ঋগ্বেদে ১৬ বার, যজুর্বেদে ১০ বার, অথর্ববেদে ৪ বার এবং সামবেদে ১ বার উল্লেখ করা হয়েছে ।



অপরদিকে শ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণে আছে,

“অজ্ঞান হেতু ক্রোত মোহমদ অন্ধকার নাশম্
বিধায়েম হি তদু দেতে বিবেকা ।”

অর্থৎ- যখন অসংখ্য ব্যক্তি সামগ্রিক কল্যাণের উদ্ভবে মানুষের সত্য সন্ধিৎসা অর্জিত হবে তখন মুহাম্মদের মাধ্যমে অন্ধকার দূর হয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জ্যাতি আবির্ভূত হবে ।

‘ভবিষ্য পুরাণে’ আছে, “সেই সময় মুহাম্মাদ নামক পবিত্র স্লেচ্ছ সপার্ষদ আসবেন । রাজা ভোজ তাঁদের বলবেন-‘হে মরুভূমির বাসিন্দা, শয়তানকে পরাস্তকারী, অলৌকিকিতার মালিক, মন্দ থেকে পবিত্র, সত্য অবহিত এবং খোদার প্রেম ও গোপন তত্ত্বের প্রতিমূর্তি তোমাকে নমস্কার । তুমি আমাকে তোমার স্মরণাগত দাস ভাবো । রাজা ভোজের কাছে রক্ষিত পাথরের মূর্তির জন্য মুহাম্মাদ বলবেন যে সে তো আমার ঐটো খেতে পারে । এ কথা বলে রাজা ভোজকে এরূপই অলৌকিকতা দেখাবেন । একথা শুনে ও দেখে রাজা ভোজ অত্যন্ত তাজ্জব হয়ে যাবে । আর স্লেচ্ছধর্মে তার প্রতিতি জন্মাবে ।” (ভবিষ্য পুরাণ, খন্ড-৩, তৃতীয় অধ্যায়, প্রতিশত পর্ব, ৫- ১৬ সংখ্যক শ্লোক)

(From the Bhavishwa Purana, Creation, part 3, chapter 3)

Muhammad has been described as the last Messenger of God in the Puranas. Muhammad appeared during the reign of king Bhoja. Seeing a world-wide decline of religion, King Bhoja went to Arabia.

There he met a Mlechcha Master called Muhammad, whom he found surrounded by his companions. The King washed the great Sage of the desert with water from the Ganges [perhaps meaning holy water]; anointed him with sandal-wood paste mixed with the five products of the cow (viz. milk, coagulated milk, butter, liquid and solid excreta); and thereby pleased Lord Shiva. In paying his obeisance he said, “ ‘O’ Master of the desert, destroyer of the monsters, versed in the highest knowledge, protected by the Mlechchas, pure and true, embodiment of conscious and joyful beneficence, mysalutations to you! Accept me, one whose plase is under your feet, as your slave!”-Verses 15-17)

King Bhoja had an idol with him made of stone. When Muhammad saw that, he said, “one whom you worship, eats my left-overs.” Saying this, he did indeed feed the idol with his left-overs. When he heard and saw this, King Bhoja was bewildered. He then accepted the Mlechcha religion. Verses 15-17.

During the night, Angel appeared in the garb of a demon, and addressed King Bhoja, “ ‘O’ King! Even though your religion is the best of all religions, from now on, I will name it as a demonic religion, by the command of God. From now on, the one who has got his foreskin removed, who does not wear a tiki, who is bearded, and who invites loudly (i.e. gives Azaan to call to prayers), will be dear to me. He will eat of clean animals. He will rid all religions of their superstitions. This will be my religion.” Having said this, the Angel disappeared.- Verses 23-28.

The word Ahmad is so exalted that it has been used in the Rigveda (8:6:10), in the Atharvaveda (20:11:1), in the Samveda (verse 152 and 1500) and in the Bhaviswa Purana, Creation, part 3, chapter 4.

In addition to that, the word Allah has been used in the Rigveda. (9:67:30 and 3:30:10).

ভবিষ্যপুরানে আছে,

“লিঙ্গচ্ছেদী শিখাহীনঃ শ্মশ্রুধারী সে দুষকঃ ।
উচ্চালাপী সর্বভক্ষী ভবিষ্যতি জমোমম ॥২৫
বিনা কৌলংচ পশবস্তেষাং ভক্ষ্যা মতা মম ।
মুসলেনৈব সংস্কারঃ কুশৈরিব ভবিষ্যতি ॥ ২৬
তন্মানুসলবন্তো হি জাতয়ো ধর্ম দুষকাঃ ।
ইতি পৈশাচধমশ্চ ভবিষ্যতি ময়াকৃতঃ ॥২৭”

(ভবিষ্য পুরাণ, শ্লোক : ১০-১৭)



অর্থাৎ আমার অনুসরণকারী লিঙ্গের ত্বক্ছেদন (খতনা) করবে। সে টিকিহীন ও দাড়ি বিশিষ্ট হবে; সে এক বিপ্লব আনবে। সে উচ্চস্বরে ধ্বনি (আজান) করবে। সে সর্বপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য (হালাল দ্রব্য) ভক্ষণ করবে; সে শূকর মাংস আহার করবে না। সে তৃণলতা দ্বারা পূত পবিত্র হবে। ধর্মদ্রোহী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সে মুসলমান নামে পরিচিত হবে। আমার দ্বারা এই মাংসহারীদের ধর্ম স্থাপিত হবে।

সামবেদে আছে,

“মদৌ বর্তিতা দেবা দকারান্তে প্রকৃতিতা।

বৃষনাং বক্ষয়েৎ সদা মেদা শাস্ত্রেচস্মৃতা।”

অর্থাৎ যে দেবের নামের প্রথম অক্ষর ‘ম’ এবং শেষ অক্ষর ‘দ’ এবং যিনি বৃষমাংস (গরুর মাংস) ভক্ষণ সর্বকালের জন্য পুনঃ বৈধ করবেন, তিনিই হবেন বেদ অনুযায়ী ঋষি। (The devota whose name starts a 'ma' and ends with a 'Da' and who re-establishes the tradition of eating beef, According to the Vedas he is the man who is highly adorable.)

কঙ্কি অবতার সম্পর্কে ‘কঙ্কি পুরাণ’ ও বিভিন্ন হিন্দু গ্রন্থাবলীতে যে ভবিষ্যৎবানী করা হয়েছে তা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কেই বোঝানো হয়েছে।

সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে সত্যিই যদি বৃটিশদের চক্রান্তে বেদ-পুরাণ সৃষ্টি হয়েছে তাহলে সেখানে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নাম কি করে রয়েছে? তাহলে কি খ্রীষ্টানরা সেখানে নবী (সাঃ) এর নাম লিখে দিয়েছে? এর উত্তর হল যেহেতু শ্রী বি. আর্য ভবিষ্য পুরাণ সম্পর্কে লিখেছেন, “কৃষ্ণ দৈপায়ন ব্যাস মহাশয়ের ছদ্মনামে কেশব সেনই ঐ পুরাণটি লিখেছেন। লিখেছেন বাইবেলের কায়দা চুরি করে।”

আর বাইবেলে হযরত ঈশা (আঃ) আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবানী রয়েছে। হযরত ঈশা (আঃ) বলেছেন,

“I will pray the Father and he shall give you another Comforter that he may abide with you for ever.” (John 14-10)

অর্থাৎ আমি আমার স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করব এবং তিনি তোমাদের জন্য আর একজন ‘শান্তিদাতা’ প্রেরণ করবেন। তিনি যেন তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকতে পারেন।

“It is expedient for you that I go away I go not away the comforter will not come unto you,” (John 19-7)

অর্থাৎ আমার উচিত যে আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য চলে যাই, কারণ আমি না গেলে সেই ‘শান্তিদাতা’ আসবেন না ।

“When he is come he will reprove the world of sin, and of righteousness and of Judgement.” (John 16-8)

অর্থাৎ এবং তিনি এসে বিশ্বজগৎকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন ।

“I have yet many things to say unto you, But ye cannot bear them now.” (John 16-12)

অর্থাৎ এখন তোমাদের কাছে আমার বহু কথা বলার ছিল কিন্তু তোমরা সে সব এখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না ।

“Howbeit when he, the sprit of truth is come, he will guide you into all truth for shall not ypeak of himself, But what sayer he shall, heat that shall he Speak and he will shew you things to come.” (John 16-13)

অর্থাৎ যাইহোক সেই সত্য আত্মা যখন আসবেন তখন তিনি পূর্ণ সত্যের পথে তোমাদেরকে পরিচালিত করবেন । কারণ তিনি নিজের তরফ হতে কিছুই বলবেন না । তিনি যা বলবেন প্রভুর নিকট হতে শুনেই বলবেন । আর ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার নমুনাও তিনি তোমাদেরকে দেখাবেন ।

বেদ পুরাণ ঘটিত কর্মকাণ্ডে যেহেতু রামমোহন রায় ও বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীরা লিপ্ত ছিলেন সেজন্য তাঁরা বেদের মধ্যে একেশ্বরবাদের তত্ত্ব কুরআন থেকে চুরি করেছিলেন । যেহেতু রামমোহন রায় কুরআন শরীফ পড়ে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন ।

কুরআন শরীফ	বেদ
১) ‘আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন’ অর্থাৎ যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালকের জন্য (সুরা ফাতেহা ১ নং আয়াত)	১) ‘মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতি’ অর্থাৎ এই বিশ্বের স্রষ্টার জন্য প্রশংসা । (ঋকবেদ : ৫-৮ ১- ১)



কুরআন শরীফ	বেদ
২) ‘আর রহমানির রহিম’ অর্থাৎ যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু । (সুরা ফাতেহা ২ নং আয়াত)	২) ‘বসুর্দয়মান’ অর্থাৎ যিনি দাতা ও দয়ালু । (ঋকবেদ : ৩-৩৪-১)
৩) ‘ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম’ অর্থাৎ আমাদেরকে সরল পথ দেখান । (সুরা ফাতেহা ৫ নং আয়াত)	৩) ‘নয় সুষমা রায়ে অস্মান’ অর্থাৎ আমাদের উপকারের জন্য সোজা পথ দেখান । (যজুর্বেদ : ৪০-১৬)
৪) ‘আলাম তা’লাম আন্নাল্লাহা লাহ্ মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়ামা লাকুম মিন দুনিয়াহি মিউ অলিয়্যিও ওয়ালা নাসীর’ অর্থাৎ তুমি কি জানো না, আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই ? এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনও অবিভাবক ও সাহায্যকারী নেই । (সুরা বাকারাহ ১০৭ নং আয়াত)	৪) ‘মহোদিবঃ প্রথিভয়শ্চ সম্রাট’ অর্থাৎ তিনি সুবিশাল পৃথিবী ও আকাশের সম্রাট । (ঋকবেদ)
৫) ‘ওয়া খালাকা কুল্লা শাইয়িন’ অর্থাৎ আর তিনি যাবতীয় বস্তু সৃজন করেছেন । (সুরা আল ফুরকান ২ নং আয়াত)	৫) ‘প্রজাপতি অনয়তি প্রজা ইনাঃ’ অর্থাৎ পরমাত্মা সমস্ত সৃষ্টবস্তুকে সৃজন করেছেন । (অথর্ববেদ : ৭-১৯-১)
৬) ‘ওয়া হুয়া যুতয়িম ওয়ালা যুতয়ামু’ অর্থাৎ তিনি সবাইকে আহার করান । তাঁকে আহার করানো হয় না । (সুরা আনআম ১৪ নং আয়াত)	৬) ‘অনশ্লন্যে অভিবাচক শীতি’ অর্থাৎ পরমাত্মা নিজে আহার করেন না । অপরকে আহার করানোর ব্যবস্থা করেন । (ঋকবেদ : ১-১৬৪-২০)
৭) ‘লাইসা কা মিসলিহী শাইউন’ অর্থাৎ তার সদৃশ কোনও বস্তু নেই । (সুরা ১১)	৭) ‘ন তস্য প্রতিমা অস্তি’ অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরের কোনও মূর্তি হয় না । (ঋকবেদ : ৩২-৩)
৮) ‘ওয়া লিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিব’ অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম দিক আল্লাহরই । (সুরা বাকারাহ ১১৫ নং আয়াত)	৮) ‘ইয়াৎস্নেবাঃ প্রদিশঃ’ অর্থাৎ সমস্ত দিক তাঁরই । (ঋকবেদ : ১০-১২-৪)



কুরআন শরীফ	বেদ
৯) ‘ফা আইনামা তুআল্লু ফাসাম্মা ওয়াজহল্লাহু ইন্নাল্লাহা ওয়াসীউন আলীম’ অর্থাৎ আর যে দিকেই তোমরা মুখ ফেরাও না কেন, সে দিকেই আল্লাহর দিক । ৬) ‘ওয়া হুয়া যুতয়িম ওয়ালা যুতয়ামু’ অর্থাৎ তিনি সবাইকে আহার করান । তাঁকে আহার করানো হয় না । (সূরা আনআম ১৪ নং আয়াত)	৯) ‘সবিতা প্রচাতাৎ সবিতা পুরস্তাৎ সবিতোসর তাৎ সবিতাধরাতাৎ’ অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিম, উপরে-নীচে সব স্থানেই বিশ্বস্রষ্টা আছেন । (ঋকবেদ : ১০-৩৬-১৪)
১০) ‘আল কাবীরুল মুতা আলা’ অর্থাৎ তিনি মহান সর্বোচ্চ মর্যাদাবান । (সূরা রা’দ নং নং আয়াত)	১০) ‘অন্ধো দেব মহা’ অর্থাৎ খোদা যথার্থই অত্যন্ত সুবিশাল । (অথর্ববেদ : ২০-৫৮-১৩)
১১) ‘লা তাবদীলা লিকালিমাতিল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহর বানীর কোনও পরিবর্তন নেই । (সূরা ইউনুস ৬৪ নং আয়াত)	১১) ‘অদক্কানি বরুনস্য ব্রতানি’ অর্থাৎ খোদার বিধান অপরিবর্তনীয় । (ঋকবেদ : ১-২৪-১০)
১২) ‘ওয়া লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বি লিয়াজযিয়াল লায়ীনা আসাউ বিমা আমিলু ওয়া ইয়াজযিয়াল লায়ীনা আহসানু বিল হুসনা’ অর্থাৎ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই । যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যাঁরা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার । (সূরা নজম ৩১ নং আয়াত)	১২) ‘ইয়ং ইয়জস্ব স্বয়ং ভূবস্ব’ অর্থাৎ তুমিই কর্ম করো এবং তুমিই তার ফল ভোগ করো । (যজুর্বেদ : ২৩-১৫) অথবা আরও বলা হয়েছে ‘ইমে চিং তব মন্যবে বেপেতে ভিয়সা মহী হয়দিন্দ্র বজ্রিননোজসা বৃত্রং মরুত্বাঁ অবধোরচন্নু স্বরাজ্যম’ অর্থাৎ ওগো খোদা ! আসমান- জমীন তোমার প্রতাপে প্রকম্পিত । ওগো খোদা ! তুমি অসংদের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করো এবং সৎসীলদের আত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব কায়ম করে থাকো । (ঋকবেদ : ১-৮০-১১)



কুরআন শরীফ	বেদ
<p>১৩) ‘হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়াযযাহিরু ওয়াল বাতিনু ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইউন আলীম’ অর্থাৎ তিনি আদি তিনি অন্ত; তিনি ব্যাপ্ত তিনি গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত । (সুরা হাদীদ ৩ নং আয়াত)</p> <p>১৪) ‘ওয়া আনতুম তাতলুনাল কিতাব আফালা তা’য়কিলুন’ অর্থাৎ অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো । তবে কি তোমরা বোঝ না ? (সুরা বাকারা ৪৪ নং আয়াত)</p> <p>১৫) ‘ওয়া লান তাজিদা লিসুনাতিল্লাহি তাবদীলা’ অর্থাৎ তুমি আল্লাহর বিধানে কোনও পরিবর্তন পাবে না । (সুরা ফাতাহ ২৩ নং আয়াত)</p>	<p>১৪) ‘উৎ তুঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচম্ উৎ শ্রাবন্ন শনোত্যেনাম’ অর্থাৎ নির্বোধ লোকেরা গ্রন্থ দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না । (ঋকবেদ : ১০-৭১-৪)</p> <p>১৫) ‘ন কিরস্য প্রতিনস্তি ব্রতানি’ অর্থাৎ খোদার বিধান কেউ পাল্টাতে পারে না । (অথর্ববেদ : ১৮-১-৫)</p>

এরকম বহু সাদৃশ্য কুরআন শরীফে ও বেদে রয়েছে । যেগুলো ইংরেজদের চক্রান্তে চক্রান্তকারীরা কুরআন শরীফ থেকে নকল করেছেন । এমনকি কলমাকেও বেদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে । যেমন,

লা ইলহা হরতি পাপম
ইল্লা ইলহা পরম পদ্ম
জন্ম বৈকুণ্ঠ পর অপ ইনতিত
জপি নাম মুহাম্মাদম ।

(উত্তরায়ন বেদ, অনকহি পরিচ্ছেদ, পঞ্চম অধ্যায়)

অর্থাৎ ‘লা ইলহা’ বললে সব পাপ মাফ হয়ে যায় । ‘ইল্লাল্লা’ বললে প্রচুর সম্মানের অধিকারী হওয়া যায় । যদি চিরতরে স্বর্গে বাস করতে চাও তবে মোহাম্মাদের নাম জপ কর ।



ইসলামের মতো বেদে আরও বলা হয়েছে, “হোতার মিন্দ্রো, হোতার মিন্দ্রো, মহাসুরিন্দ্রো অল্প জ্যেষ্ঠং, শ্রেষ্ঠং পরমপূর্ণ ব্রহ্মনং অল্লাম, আল্লাহ রসল মুহাম্মাদরং কং বরস্য অল্প অল্লাম, আব্দুল্লাহ বুক মেকং আল্লাহ নির্মাত কম ।”

অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব আছে । আমার অস্তিত্ব আছে । আমি আল্লাহ জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ পরমপূর্ণ ব্রহ্মা । আমি আল্লাহ । আল্লাহর রসুল মুহাম্মাদের তুল্য আর কে আছে ? আমি আল্লাহ সহ অবিনশ্বর এক এবং স্বয়ম্ভু । (অথর্ববেদ : উপনিষদ অল্পপ নিয়ম পরিচ্ছেদ)

ALLOPANISHAT.
 অস্মাল্লা ইল্লে মিত্রাবরুণা দিব্যানি ভ ন্তে ॥ ইল্লে বরুণো রাজা পুনর্দ্বুঃ,
 ইয়ামিষো ইল্লা ইল্লে ইল্লা বরুণো মিত্রস্তেজস্কামঃ ॥ ১ ॥ হোতারমিন্দ্রো
 হোতারমিন্দ্র মহাসুরিন্দ্রাঃ ॥ অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরম পূর্ণ ব্রাহ্মণং অল্লাম ॥ ২ ॥
 অল্লোরসূলমহামদরকবরস্য অল্লো অল্লাম ॥ ৩ ॥ আদল্লাবুকমেককম্ ॥ অল্লাবুক
 নিখাতকম্ ॥ ৪ ॥ অল্লো যজ্ঞেন হুতহুত্বা ॥ অল্লা সূর্য্য চন্দ্র সর্ব সন্ধাঃ ॥ ৫ ॥
 অল্লা ঋষীণাং সর্ব দিব্যা ইন্দ্রায় পূর্ব মায়া পরমমন্তরিকাঃ ॥ ৬ ॥ অল্লঃ পৃথিব্যা
 অন্তরিক্ষং বিশ্বরূপম্ ॥ ৭ ॥ ইল্লা কবর ইল্লা কবর ইল্লা ইল্লেতি ইল্লেলাঃ
 ॥ ৮ ॥ অম্ অল্লাইল্লেলা অনাদিস্বরূপায় অথর্বনাশ্যামা হুঁ হ্রী জনান
 পশুনসিদ্ধান জলচরান অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট ॥ ৯ ॥ অসুর সংহারিণী হুঁ হ্রী
 অল্লোরসূল মহামদরকবরস্য অল্লো অল্লাম ইল্লেতি ইল্লেলাঃ ॥ ১০ ॥

“অথাল্লোপনিষদ ব্যাখ্যাশ্যামঃ ।

অস্মাল্লা ইল্লে মিত্রাবরুণা দিব্যানি ভ ন্তে ।

ইল্লে বরুণো রাজা পুনর্দ্বুঃ ।

হমা মিত্রো ইল্লা ইল্লে ইল্লা বরুণো মিত্রস্তেজস্কামঃ ॥ ১ ॥

হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্র মহাসুরিন্দ্রাঃ ।

অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরম পূর্ণ ব্রাহ্মণং অল্লাম ॥ ২ ॥

অল্লোরসূলমহামদরকবরস্য অল্লো অল্লাম ॥ ৩ ॥

আদল্লাবুকমেককম্ । অল্লাবুক নিখাতকম্ ॥ ৪ ॥

অল্লো যজ্ঞেন হুতহুত্বা । অল্লা সূর্য্যচন্দ্রসর্বনক্ষত্রাঃ ॥ ৫ ॥

অল্লা ঋষীণাং সর্বদিব্যা ইন্দ্রায় পূর্ব মায়া পরমমন্তরিকাঃ ॥ ৬ ॥

অল্লঃ পৃথিব্যা অন্তরিক্ষং বিশ্বরূপম্ ॥ ৭ ॥

ইল্লা কবর ইল্লা কবর ইল্লা ইল্লেতি ইল্লেলাঃ ॥ ৮ ॥

অম্ অল্লাইল্লেলা অনাদিস্বরূপায় অথর্বনাশ্যামা হুঁ হ্রী জনানপশুনসিদ্ধান

জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট ॥ ৯ ॥

অসুরসংহারিণী হুঁ হ্রী অল্লোরসূলমহামদরকবরস্য অল্লো অল্লাম ইল্লেতি

ইল্লেলাঃ ॥ ১০ ॥

ইত্যল্লোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

বেদের সারাংশ উপনিষদে আছে, “আল্লাহ রসল মুহাম্মাদ কং বরস্য” অর্থাৎ আল্লাহর রসুল মুহাম্মাদ তোমাদের বরনীয় ।



চক্রান্তগারগুলি কোথায় ছিল ?

লেখক বি. আর্থ লিখেছেন, “আসলে ইংরেজী, ফারসী, জার্মান, পর্তুগীজ, বুলগেরীয় ইত্যাদী ইউরোপীয় নানান ভাষার শব্দই ঐ সংস্কৃত ভাষায় রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে ল্যাটিন, গ্রীক শব্দও।.....উত্তর প্রদেশের বানারস আর গাজীপুর জায়গাদুটোতে সংস্কৃত সাজানো ছদ্মবেশে বারানসী ও গর্জতীপুর বলে চালানো হল। যশোর জেলার কালিয়া ও ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া থেকে বাছাই করা বেশ কিছু সংস্কৃত পণ্ডিতকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঐ বানারস ও গাজীপুরে। নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঐদের দিয়ে বেদ লেখানোর কাজটা করিয়ে নিতে। ঐদের সঙ্গে বেশ কিছু মারাঠী, গুজরাতি, ভোজপুরী ও মৈথিলি সাকরেদও ছিলেন। সাকরেদ ছিলেন বাঙলা ভাষী নানান জেলা থেকে পাঠানো কিছু পণ্ডিতও। ঐদের যৌথ প্রয়াসে গোপনীয়তার পরিমণ্ডল রচনা করেই বৈদিক বুজরুকি লেখা শুরু হয়েছিল।”

লেখক বি. আর্থ আরও লিখেছেন, “কালিয়া-কোটালীপাড়া থেকে যে সব পণ্ডিতকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁদের কেউই যশোর বা ফরিদপুর জেলার আদি বাসিন্দা ছিলেন না। ঐদের সকলেরই আদি বাসস্থান ছিল মেদিনীপুর [সংস্কৃত ছদ্মবেশে মেদিনীওপুরা জেলার তমলুক। সংস্কৃত নামক ‘দেবভাষা’ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও নেপথ্য কর্মকাণ্ড পরিচালনায় করিৎকর্মার [কৃতকর্মণঃ] পরিচয় দিয়ে তমলুক-মেদিনীপুরের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সৌজন্যে যশোর, ফরিদপুর সহ নানান জেলার প্রচুর জমির মালিক হয়ে বসেছিলেন।” (প্রাচীন যুগের ইতিহাস লেখার নেপথ্য কথা, পৃষ্ঠা-৪৬-৪৭)

লেখক আরও লিখেছেন, “সংস্কৃত রামায়ন মহাভারত যে প্রাচীনকাল থেকে সারা ভারতে [এমন কি বহির্ভারতেও কিছু জায়গায়] ব্যাপকভাবে প্রচলিত - এই কথাই পণ্ডিতেরা জানিয়ে আসছেন। তাই যদি হবে তবে বই দুটির পুঁথি মাত্র দু-তিনটি পাওয়া গেল কেন? পণ্ডিতদের ধারণাটা সত্যি হলে যে অনেক বেশী পুঁথি পাওয়ার কথা। যে দু-তিনটি পাওয়া গেছে বলে প্রচার করা হয়েছে তাও দেখছি সবই ইউরোপে পাচার করা হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা কি? রামায়ন - মহাভারতের পূর্ণ কলেবর পুঁথি কি সত্যিই কেউ দেখেছেন, নাকি সেও এক মায়া?.....রাজা - মহারাজাদের বাড়িতেও দু - একটা পুঁথি মেলেনি কেন?” (প্রাচীন যুগের ইতিহাস লেখার নেপথ্য কথা, পৃষ্ঠা-৫৬)

লেখক আরও লিখেছেন, “বলে মনে রাখা ভাল ‘বেদান্ত’ শব্দটা খাঁটি মারাঠি। শব্দটির অর্থ দর্শন। শব্দটি বেশ কিছু উপনিষদের সমার্থক শব্দ হিসাবে সংস্কৃতে ঠাঁই পেয়েছে। যেন কতই না প্রাচীন ঐ শব্দটি। কাঁচা সংস্কৃতে লেখা কঠোপনিষদ রামমোহন রায়ের বাঙলা হিন্দি ও ইংরেজী তর্জমা সহ প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে। যে সব জায়গায় ধর্মগ্রন্থ চক্রের কারখানা ছিল পূর্বে উল্লিখিত বানারস, গাজীপুর, তমলুক,



মেদিনীপুর, কোটালীপাড়া ছাড়াও বিক্রমপুর, লাভপুর, পাত্রসায়র, ভাটপাড়া - নৈহাটি প্রভৃতি জায়গা উল্লেখযোগ্য ।”

লেখক আরও লিখেছেন, “মরে ভূত হয়ে যাওয়া ভাষায় ছাইভস্ম লিখে রায় বাহাদুর, বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায়, হয়ে বসতেন । ঐদের দিয়ে সংস্কৃত - পালি - প্রাকৃত - অপভ্রংশ - অবহট্ট ভাষায় কেতাব লেখানোর এক মোচ্ছব শুরু হয়েছিল ।”

লেখক আরও লিখেছেন, “সংস্কৃত জানা পণ্ডিতদের ওপরে যে কত রকমের দায়িত্ব চাপানো ছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয় । তাদের দিয়ে লেখানো হত ঐতিহাসিক তথ্যে ভরপুর নানান ‘গ্রন্থ’ । কাউকে দিয়ে ‘মূল’ গ্রন্থ, কাউকে দিয়ে তার টীকা টিপ্পনী । কেউ সাজতেন ব্যাস বা বাল্মীকি কেউ সাজতেন সায়নাচার্য বা মহীধর । কাউকে দিয়ে লেখানো হত শিলালিপি বা তাম্রশাসনের বয়ান । যেগুলিকে পরবর্তীকালে ইতিহাসের কাঁচামাল বলে চালানো হত । কাউকে দিয়ে লেখানো হত পালি - প্রাকৃত - অপভ্রংশ - অবহট্ট মার্কী নামের ভাষার কেতাব লেখানোর পূর্বকৃত্য হিসাবে বানিয়ে রাখা সংস্কৃত ‘আদিরূপ’ যাকে রসিকতা করে বলা হত ‘ছায়া’ । আর তার ছায়া অবলম্বনে বানানো কাণ্ডকারখানাগুলোকে বলা হত ‘মূল’ ।” (প্রাচীন যুগের ইতিহাস লেখার নেপথ্য কথা, পৃষ্ঠা-৯৯)

লেখক আরও লিখেছেন, “সংস্কৃত সাহিত্য বানাতে যেমন প্রধানতঃ বাঙালী পণ্ডিতদের কাজে লাগানো হয়েছিল তেমনি পালি, প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষার সাহিত্য বানাতে গিয়েও ঐ বাঙালীদেরই দ্বারস্থ হতে হয়েছিল ইতিহাসের কাঁচা মাল বানানোর নেপথ্য প্রযোজকদের ।” (প্রাচীন যুগের ইতিহাস লেখার নেপথ্য কথা, পৃষ্ঠা-১০১)

লেখক আরও লিখেছেন, “পুঁথির কাগজ যে মেট্রিক পদ্ধতিতে কাটা হয়েছিল তা বুঝতে কষ্ট হয়না । কিন্তু হাজার হাজার বছরকার পুরনো কাগজ টিকল কি করে ? তখন কাগজ তৈরী হয়েছিল কি ? কোনরকমে যদি ঐ মিথ্যাটা মেনেই নেওয়া হয় তাহলে দৈর্ঘ্য প্রস্থ সেন্টিমিটার অর্থাৎ মেট্রিক পদ্ধতিতে হয় কি করে ?.....দৈর্ঘ্য মাপার কাজে মেট্রিক পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয় ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই । অতএব পুঁথিটা পাঁচশ বছরের পুরনো নয় - ওটা যে উনিশ শতকের জালিয়াতি তাতে সন্দেহ নেই ।” মজার ব্যাপার হল “পুঁথির কাগজ আলোর সামনে ধরতেই Made in France জলছবিটা দেখা গেল ।” এর রহস্য ফাঁস করতে গিয়ে লেখক আরও লিখেছেন, “পুঁথির কাগজের রঙ হলদে কারণ পোকামাকড় বা ইঁদুরের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু আর্সেনিক ঘটিত যৌগ মিশ্রিত হলুদ গোলা জলও পুঁথির কাগজে মাখিয়ে রাখা হত । পাঁচশ বছর আগে ঐ আর্সেনিক কাকে বলে কেউই জানতেন না ।”



‘আর্য’ শব্দটা ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সৃষ্টি হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে। তবে সেই শব্দটা আর্য ছিল না বরং ছিল আর্যবর্ত।

লেখক আরও লিখেছেন, “প্রাচীনকালে রাজা মহারাজাদের পণ্ডিত পুষে রাখার গল্পটাকে লোকে যাতে সন্দেহ না করে বসে তার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে ঐ ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা মারফতই। ভারতের দেশীয় করদ রাজ্য মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, রাজপুতানা ইত্যাদি নানান রাজ্যের রাজা মহারাজারাও পণ্ডিত পুষতেন।.....ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মহারাজার আশ্রয়ে থেকে গণপতি শাস্ত্রী ভাসের লেখা তেরোখানা নাটকের সম্পাদনা করে ‘মহামহোপাধ্যায়’ খেতাব পেয়েছিলেন। পরে জানা গিয়েছিল ঐ তেরোখানাই জাল কিতাব। জালিয়াতি করে এই কায়দায় সাম্রাজ্যীও ‘মহামহোপাধ্যায়’ হয়েছিলেন। দেশীয় রাজা - মহারাজাদের আশ্রয়ে থেকে তাঁরা যে ব্রিটিশ সরকারের সেবাদাস হিসাবেই কাজ করেছিলেন এইটাই কেউ বোঝেন নি। প্রাচীন বলে চালানো বইপত্র লেখানোর দায়টা দেশীয় রাজ্যগুলোর উপরে চাপানো দরকার ছিল। নেপথ্যে থাকা ব্রিটিশ সরকার নিজেদের সন্দেহের উর্দে রাখার ব্যবস্থা করে নিতেন রাজাদের দিয়ে পণ্ডিত পোষার খেলা দেখিয়ে।”

রামায়নের জন্মরহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক লিখেছেন, “কীর্তিবাস এর লেখা বাঙলা রামায়ন আর কাশীদাসের লেখা বাঙলা মহাভারতের প্রথম সংস্করণের [প্রকাশকাল ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ] বইদুটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে। বইদুটির কলেবর কালক্রমে বাড়তে বাড়তে আজ যা দাঁড়িয়েছে তা ওই প্রথম সংস্করণের বইদুটির যে দেড়গুনেরও বেশি হবে তা বেশ জোরে দিয়েই বলা যায়।.....তবে কি পুরো ব্যাপারটার পিছনে রাষ্ট্রের বা সরকারের মতলববাজী কাজ করছিল? তাই তো আসছে। কালিদাসের ‘মেঘদূত’ -এর ‘প্রক্ষিপ্ত’ অংশ আবিষ্কার করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। সম্প্রতিকালে সুকুমার সেন মহাশয়ও কাব্যটির মধ্যে কিছু ‘প্রক্ষেপে’র সন্ধান পেয়েছেন। কন্মল থেকে লোম বাছতে গেলে এই হয়। প্রাচীন সাহিত্যের ষোল আনাই ‘প্রক্ষিপ্ত’। ষোল আলাই বেনামে লেখা।”

উপনিষদ সম্পর্কে লেখক লিখেছেন, “উপনিষদ নামক চালাকিটাকে ছাপার অঙ্করে প্রকাশ করার এক নম্বর ম্যাজিক দেখিয়েছেন রামমোহন রায়। সংস্কৃত উপনিষদগুলোর কোনও পুঁথি পাওয়া যায় নি। পাওয়া গিয়েছিল কিছু উপনিষদের ফারসী অনুবাদ। অন্ততঃ প্রচারটা এরকমই রাখা হয়েছে।.....বেশ কিছু উপনিষদের বাঙলা, হিন্দি ও ইংরেজী অনুবাদ যে রামমোহন রায় নিজেই করেছিলেন - একথাই জানানো হয়েছে।”

লেখক আরও লিখেছেন, “বেদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের নামের তালিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামও ছিল। প্রশ্ন আসছেই। এক, বিদ্যাসাগর মহাশয় বৈদিক

ভাষা শিখলেন কবে ?.....তিনি সংস্কৃত ভালোই আয়ত্ত করেছিলেন । সে ভাষায় কাব্য রচনার ক্ষমতাও তাঁর ছিল । তবে তিনি ঐ বৈদিক ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন - তথ্য দৃষ্টে মেনে নিতে কষ্ট হয় । দুই বৈদিক ভাষা যদি তিনি জানতেনই তবে সেকথা তিনি গোপন রাখতে গেলেন কেন ?”

এরপর লেখক লিখেছেন, “তবে কি ধাঁ ধাঁ মার্কী ভাষায় লেখা বেদের কিছু অংশ তিনি নিজেই লিখেছেন ? বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ঐ ঋক বেদের বাংলা অনুবাদ করার কাজে সহযোগিতা করেছিলেন তা জানা যাচ্ছে ঐ বাঙলা ঋগ্বেদের ভূমিকায় । রমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় ঐ অনুবাদগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ।”

ঋকবেদের রচয়িতা ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় । তা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বি. আর্থ লিখেছেন, “বাঙলা ঋগ্বেদের ভাষার মান উঁচু ছিল । ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ঐ ধরনের ভাষায় লেখার ক্ষমতা একজনেরই ছিল । আর তা বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই । বাঙলা ঋগ্বেদের অংশবিশেষ নয় - পুরো বইটির ভাষার মান একই রকম উন্নত ছিল । একজনের লেখা না হলে ভাষার মান সমান থাকার কথা নয় । আসলে পুরো বইটি বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই লেখা ।”

যেহেতু বিদ্যাসাগর মহাশয় সরকারী চাকরী করতেন সেজন্য বেদ রচনার চক্রান্তে ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য না করে উপায় ছিল না ।

সংস্কৃত ভাষাও ইংরেজদের চক্রান্তে সৃষ্টি

সংস্কৃত ভাষাটাকে ইংরেজদের ইশারায় ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী ভাষা থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করে তৈরী করেছেন । বিভিন্ন ভাষার শব্দগুলিকে একত্রিত করে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে । ভারতের নানান ভাষার অনেক শব্দকে অবিকৃত ভাবেই সংস্কৃত ভাষায় রাখা হয়েছে এবং ভারতের নানান ভাষার অনেক শব্দ সংস্কার করে নতুন নতুন শব্দ না বানিয়ে ঐ সব ভাষারই অন্য অর্থযুক্ত প্রচলিত শব্দ দিয়েই তা প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে । যেমন, খাঁটি বাঙলা শব্দ কেন্নো, কানাকানি, কালা, কালি, কেঁচো, কুঁচ, কুঁচেমাছ, কুচি, কুলো, কুল, কাঁকলাস কে সাজিয়ে গুছিয়ে সংস্কৃত বলে চালানো হয়েছে । সেগুলো যথাক্রমে কর্ণকীট, কর্ণোজলেক, কার্ণস্ফাটিকা, কর্ণাকণী, কর্ণকালিকা (লেখার কালি), কিঞ্চিলক, কিঞ্চিলুক, কুঞ্চিক, কুল্য, কুবল, কুকোলাস প্রভৃতি ।

খাঁটি উড়িয়া ভাষা থেকে জোগাড় করা শব্দ কাছা, কাছু, কইথ, কহনী, কখারু, কনিঅর ও কুহুডি হতে সংস্কৃত করে নেওয়া হয়েছে যথাক্রমে কচ্ছ, কচ্ছু, কপিথ,



কফোনি, কর্কার, কর্ণিকার ও কুরহেডিকা । উড়িয়া ভাষার কুদযন্ত্রকে সংস্কৃতে করা হয়েছে কুন্দ । ‘নেত’ শব্দ থেকে করা হয়েছে নেত্র ।

মারাঠী ভাষার শব্দ কাঙ্গ, কারলী, কোরাংটা, কুল্লাল, কালরা, কোপর, কোদুকে সংস্কৃত বানিয়ে করা হয়েছে যথাক্রমে কঙ্গ, কার্বেল্য, কুরন্টক, কুলাল, কুল্য, কূর্প ও কোদ্রব । এভাবে আরও মারাঠী শব্দ সংস্কৃতে আনা হয়েছে । যেমন - করোটি, কল্মাশ, কিল্মিশ, কুরঙ্গ, কুহর, কুষ্টিবল, কোদভু, আগংতুক, অরুতা, আশ্মা, আততায়ী, আপোশন, আংশ, ইথ্যংভূত, ওল, গোফা, তুপ, থরু, পাঠায়, রিডা - মোট এই ১৩টি শব্দকে কিভাবে পরিবর্তন করে সংস্কৃত বানানো হয়েছে তা উল্লেখ করা হচ্ছে । যেমন - আগন্তুক, আর্হতা, অশ্মান, আততায়িন, আপেশান, অক্ষ, ইথস্তুত, ওল্ল, গুলফ, ত্প, থাউ, প্রস্তাব, রীটা ।

গুজরাতী ভাষা থেকেও প্রচুর শব্দ পাচার করে আনা হয়েছে । দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় যে কডী, কথো, কাবরুং, কথীর, কুকডো, কুংচী, কুটনী, কুচো প্রভৃতি শব্দগুলোকে যথাক্রমে বানিয়ে নেওয়া হয়েছে কন্ডিকা, কদর, কর্বুর, কস্তীর, কুকুট, কুঞ্চিকা, কুটনী, কূর্চ প্রভৃতি ।

এমনিভাবে সংস্কৃত অভিধানে আরও পাচার করে আনা হয়েছে কঞ্চুক, করমর্দ, কলাচি, কলিকা, কয়েলক, কুলয ও কেদারিকা প্রভৃতি শব্দগুলো হিন্দীভাষা থেকে ঢোকানো হয়েছে । যেগুলো যথাক্রমে কেংচুলী, করৌংদা, কলাই, কলী, কলেজা, কুলখী ও কিআরী শব্দেরই মাজাঘষা রূপমাত্র ।

সংস্কৃত ভাষায় সিংহলী, কাশ্মীরি, পাঞ্জাবী, নেপালী ও মৈথিলী ভাষার শব্দও যোগাড় করে আনা হয়েছে । যেমন - কপট, কমল, কলহ, কলি, কান্তি, কিরণ, কিরীট, কিশোর, কীর, কীর্তন, কীর্তি, কুঞ্জ, কুটিল, কুসুম, কূট, কূম, কৃত্রিম, কৃপণ, কেশর, কেতন, কোটর, কৌশল ইত্যাদি শব্দগুলোকে সংস্কার করার দরকার পড়েনি । এই শব্দগুলো বাংলা এবং অন্যান্য ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষায় আমদানি করা হয়েছে ।

বাংলা ভাষার আরও শব্দ অঞ্জুনীকে অর্জুন, আঁটিকে অস্তি, আমলাকে অম্লান, উঠানকে উত্থান, কাতলা (মাছ) কে কাতর, ক্যাতরা কে কীর্তি, খুদকে ক্ষুদ্র, মসনে কে মসৃণ, হিংসে কে হংস বানিয়ে নেওয়া হয়েছে ।

ফারসী ভাষার তরঙ্গ থেকে তুরঙ্গ, নায়ক থেকে নায়ক, আসতার থেকে অশ্বতর, মওম থেকে মোম, নারজীল থেকে নারিকেল, বাজ (পাখি) কে কোনো পরিবর্তন না করে বাজ, গন্দ থেকে গন্ধ, দার থেকে দ্বার, তাব থেকে তাপ, তাম্বুল কে কোনো পরিবর্তন না

করে তাম্বুল, আদরক থেকে আদ্রক, শকর থেকে শকরা, আস্ত থেকে অস্তি, আম থেকে আম্র, আব থেকে আপ, পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা, দাং থেকে দৈত্য, দেও থেকে দেব, দুশনাম থেকে দুর্নাম, গ্লেবান থেকে গ্রীবা, গ্রীবেন, অঙ্গুশত থেকে অঙ্গুষ্ঠ, অঙ্গীরা থেকে অঙ্গীর, গাও থেকে গৌ, উশতর থেকে উষ্ট্র, হপ্তহিন্দু সপ্তহিন্দু, মাহ থেকে মাস, শেগাল থেকে শূগাল, হফতা থেকে সপ্তাহ এবং শদ থেকে শত করা হয়েছে।

আরবী ভাষা থেকেও অনেক শব্দ সংস্কৃত ভাষায় আমদানী করা হয়েছে। যেমন - কলমকে পরিবর্তন না করে কলাম করা হয়েছে। আফিয়ুনকে অহিফেন, কামরু থেকে কামরূপ, দীনার থেকে পরিবর্তন না করে দীনার, সন্দল থেকে চন্দন, গেনা থেকে গান, সানামাকী থেকে সোনামুখী, শিতা থেকে শীত, বাওম থেকে ব্যাম, ফালিতাহ থেকে পলিতা, উম্মা থেকে মা, মান থেকে মণ, কাফুর থেকে কর্পূর, কার্বাস থেকে কার্পাস, সতর থেকে ছতর।

এছাড়াও সংস্কৃতের ‘প্রচ্ছ’ হিন্দির পুছ থেকে এসেছে, সংস্কৃতের অবতরণ, কুঞ্চিকা ও অন্ড এই শব্দ তিনটি হিন্দির উতারণা, কুনজি, ও আন্ডা থেকে এসেছে, বাংলার মাছকে মৎস, ডরকে দর, ছালকে ছল্লী, মাথাকে মস্তক, ঘাসকে ঘাসি, খনকে ক্ষণ, শশুরকে শশুর করা হয়েছে। ইংরেজীর End থেকে সংস্কৃতে আন্ড, সংস্কৃতে Tree তরু, Horse সংস্কৃতে হ্রেষা (ঘোড়ার ডাক), স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ Vargina সংস্কৃতে ভগ, সংস্কৃতে Greedy গৃদণ, ইংরেজী Grabbed কে সংস্কৃতে গৃভীত, Right কে সংস্কৃতে ঋত, সংস্কৃতে Night নও বানানো হয়েছে। (তথ্যসূত্র : বজ্রকলম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৯)

দেবতাদের কুকর্ম

ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রী অতুল সুর ‘ধর্মের নামে’ একখানি বই লিখেছেন তাতে লেখা আছে, “ঋক বেদে দেখি জমি তার জমজ ভ্রাতা জমের কাছে সঙ্গম প্রার্থনা করছেন। দম্ভ নিজ ভগিনী মায়াকে, লোভ নিজ ভগিনী নিবৃত্তিকে, ক্রোধ নিজ ভগিনী হিংসাকে ও কলি নিজ ভগিনী নিরুজ্জিকেকে বিবাহ করেছে। মৎস পুরান অনুযায়ী শতরূপা ব্রহ্মার কন্যা। কিন্তু ব্রহ্মা নিজ কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে অযাচারে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়। যৌনজীবনে দেবতাদের কোনরূপ সংযম ছিল না। আদিত্যযজ্ঞে মিত্র ও বরুন উর্বশীকে দেখে কামলালসায় অভিভূত হয়ে যজ্ঞকুম্ভের মধ্যে শুক্রপার (বীর্যপাত) করে। অগ্নি একবার সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের দেখে কামোন্মত্ত হয়েছিল। ঋক্ষ বজাকে দেখে ইন্দ্র ও সূর্য দুজনেই এমন উন্মত্ত হয়েছিল যে ইন্দ্র তার চিকুরে ও সূর্য তার গ্রীবাতে রক্তপাত (বীর্যপাত) করে ফেলে। রামায়ন অনুযায়ী সূর্যের বীর্য তার গ্রীবাতে ও ইন্দ্রের বীর্য তার বালে (কেশে) পড়েছিল। সূর্য অযাচারী দেবতা। চন্দ্র ব্যভিচারী দেবতা। চন্দ্র দক্ষের ৭০০টি মেয়েকে বিবাহ করেছিল। কিন্তু তাতেও তার কামলালসা পরিতৃপ্ত হয় নি।



কামাসক্ত হয়ে এসে দেবগুরু বৃহস্পতি - স্ত্রী তারাকে অপহরণ ও ধর্ষণ করে । দেবগুরু বৃহস্পতি নিজেও সাধু চরিত্রের দেবতা ছিল না । বৃহস্পতি কামলালসায় অভিভূত হয়ে নিজ জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মমতার অন্তসত্ত্বা অবস্থায় জোরপূর্বক তার সঙ্গে সঙ্গম করেছিল । আবার ঋগ্বেদে দেখি রুদ্রদেব তার নিজ কন্যা উষার সঙ্গে অযাচারে লিপ্ত হয়েছিল । পৌরাণিক যুগে বিষুই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, কিন্তু বিষু পরস্তু বৃন্দা ও তুলসীর সতীত্ব নাশ করেছিল ।.....ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর সতীত্ব নষ্ট করে এবং শাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইন্দ্রাণীর পিতা পুলমলকে হত্যা করে ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করেছিল । ইন্দ্র যে কেবল ইন্দ্রাণীর সতীত্ব নষ্ট করেছিল তা নয়, মহাভারত অনুযায়ী ইন্দ্র গৌতম মুনির অনুপস্থিতিতে গৌতমের রূপ ধারণ করে তার স্ত্রী অহল্যার সতীত্ব নাশ করেছিল । ইন্দ্র এইভাবে মর্ত্যলোকে এসে মানবীদের সঙ্গ মিলিত হত । এইভাবে বালী ও অর্জুনের জন্ম হয়েছিল । ধর্মও মর্তে এসে মানবীদের সঙ্গ মিলিত হত । ধর্মের ঔরসেই কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয় । অনুরূপভাবে অগ্নির ঔরসে মাহীশ্মতী নগরীর ইক্ষাকু বংশীয় রাজকন্যা সুদর্শনার গর্ভ হয় । পবনদেব ও হনুমানের পিতা কেশরী রাজের স্ত্রী অঞ্জনার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেছিল । সেই পুত্রই হনুমান । এইসব দেবতাদের নিয়েই আমাদের ধর্ম - কর্ম । ধর্মের নামে এদেরই পূজা করি আমরা । স্বয়ং ধর্মরাজই চরিত্রহীন ।”

ডক্টর অতুল সুর আরও লিখেছেন, “বেদে অযাচারের একাধিক দৃষ্টান্ত আছে । প্রথমেই উষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । ঋক বেদের ২০ টা সূক্তে উষা স্তুত হয়েছে । সে প্রজাপতির কন্যা, কাঞ্চনবর্ণা ও সূর্যদেবের ভগিনী । উষা বক্ষদেশ উন্মুক্ত রাখত । ব্রহ্মার ন্যায় প্রজাপতিও ছিলেনেকজন কামুক দেবতা । কৃষ্ণ যজুর্বেদের মৈত্রায়নী সংহিতা (৪/২/২২) অনুযায়ী প্রজাপতি নিজ কন্যা উষাতে উপগত (ব্যভিচারে লিপ্ত) হয়েছিল ।.....বালির জন্ম হয় সমলিঙ্গ মিলনে । শিব ও বিষু দুই দেবতাই পুরুষ । তাদের সমলিঙ্গ মিলনে ষষ্ঠের জন্ম হয় ।” (দ্রষ্টব্য ২৪ ও ২৫ পৃষ্ঠা)

অতুলবাবু আরও লিখেছেন, “উপনিষদে আছে কয়েকজন মুনি কোন এক ঋষির অপরূপ সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে কামোন্মত্ত হয়ে তাকে টানতে টানতে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় । ঐ দুঃচরিত্র মুনিদের হাত থেকে নিজের স্ত্রীকে রক্ষার কোন চেষ্টাই করে না সেই ঋষি । অসহায় মায়ের এই অপমানে পিতাকে নীরব দর্শকের ভূমিকায় দেখে পিতৃভক্ত পুত্র একেবারে বিস্মিত । ক্ষিপ্তপুত্র পিতার কাছে এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জানতে চায় । জবাবে পিতার উক্তি - নারী হচ্ছে ভোগের সামগ্রী । তাই কেউ ভোগ করতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া উচিত না । তাছাড়া এক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছারও কোন মূল্য নেই । এ প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর কথাও উল্লেখযোগ্য । দ্রৌপদী চরিত্রে যত মহত্বই আরোপ করা হোক না তার পঞ্চস্বামী ভোগ কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয় । ঠিক এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিবস্ত্রা গোপিনী দর্শনও সমর্থনযোগ্য নয় । শ্রীকৃষ্ণের এই বিকৃত রুচি সমাজের



পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি - তা শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে যত দর্শনই প্রদর্শন করা হোক ।” (পৃষ্ঠা-৬৫ ও ৬৬)

অলোকবাবু আরও লিখেছেন, “তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ ‘ম’- কার সহকারে চক্রপূজার ব্যবস্থা আছে । পঞ্চ ‘ম’- কার হচ্ছে মদ, মাংস, মৎস, মুদ্রা ও মৈথুন । তন্ত্রপূজার এগুলি হচ্ছে অত্যাৱশ্যকীয় অঙ্গ । তন্ত্রে শক্তি সাধনা ও কুলপূজার উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে । কোন স্ত্রী লোককে শক্তির প্রতীক ধরে নিয়ে তার সঙ্গে যৌন মিলনে রত থাকাই তাত্ত্বিক সাধনার মূল তত্ত্ব । গুপ্ত সংহিতায় বলা হয়েছে যে, পামর ব্যক্তি শক্তি সাধনার সময় কোন স্ত্রী লোকের সঙ্গে মৈথুন ক্রিয়ায় নিজেকে নিযুক্ত না রাখে । নিরুক্ততন্ত্র এবং অনেক তন্ত্রে বলা হয়েছে যে শক্তি সাধক কুলপূজা হতে কোনরূপ পুন্যফল পায় না যদি না সে কোন বিবাহিতা নারীর সহিত যৌন মিলনে প্রবৃত্ত হয় । একথাও বলা হয়েছে যে, কুলপূজার জন্য কোন নারী যদি সাময়িকভাবে স্বামীকে পরিহার করে তবে তার কোন পাপ হয় না । সমাজের দৃষ্টিতে যাকে অযাচার বলা হয় অনেক সময় এটা সেরূপও ধারণ করত । কেননা কুলচুড়ামণিতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, অন্য রমণী যদি না আসে তাহলে নিজের কন্যা বা কনিষ্ঠা বা জেষ্ঠা ভগিনী, মাতুলানী, মাতা বা বিমাতাকে কুলপূজা করবে । (অন্য যদি ন গচ্ছেতু নিজকন্যা নিজানুজ । অগ্রজা মাতুলানী বা মাতা তসপত্নীকা । পূর্বাভাবে পরা পূজ্যা মদংশা ঘোষিতো মতাঃ । একা চেৎ কুল শাস্ত্রজ্ঞ পূজার্হা তত্র ভৈরব)

এবার দেখা যাক সেই তন্ত্রসাধনা বা কুলপূজা কিভাবে হত - রাত্রিকালে সাধক ‘আমি শিব’ (ধ্যাত্বা শিবোহমতি) এইরূপ ভাবতে ভাবতে নগ্ন অবস্থায় নগ্না রমণী রমণ করত (ততো নগ্নাং স্ত্রিয়ং নগ্নং রমণ ক্লেদযুতোহপি বা) রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নিজ সাধন কার্যে লিপ্ত থাকবে । কুলার্ণবতন্ত্র এই সাধন প্রক্রিয়া কি তা আমি আর বাংলায় অনুবাদ করবা না । মূল সংস্কৃত শ্লোকই এখানে উদ্ধৃত করছি টু

আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ স্তনয়ো মর্দনস্তথা ।
দর্শনং স্পর্শনং যোনি বিকশো লিঙ্গ ঘর্ষণম্ ॥
প্রবেশ স্থাপনং শক্তের্নব পুষ্পা নিপুজনে ।”

(ধর্মের নামে, পৃষ্ঠা-১০৭ ও ১০৮)

যে হিন্দু বা সনাতন ধর্মের মধ্যে এরকম জঘন্য বিধান এই সেই ধর্ম কোনদিন ঐশ্বরিক ইলহামী ধর্ম হতে পারে না ।



শ্রীকৃষ্ণের কুকর্ম

রাধার নাম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অবশ্যই নেওয়া হয় । রাধা-কৃষ্ণ নাম একে অপরের সঙ্গ ওতপ্রতভাবে জড়িত । তবে মহাভারতের মধ্যে রাধার কোন বর্ণনা নেই । কেননা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ রাধার অবৈধ সম্পর্ক ছিল । আর এমন কোন হিন্দু মন্দির সাধারণত দেখা যায় না যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মূর্তি নেই ।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধার কি সম্পর্ক ছিল তা একটু আলোচনা করা যাক । ‘ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে’ রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের মামী বলা হয়েছে । এবং সেখানে এও বলা হয়েছে যে রাধা শ্রীকৃষ্ণের বাম অঙ্গ থেকে সৃষ্টি হয়েছেন । যেমন সেখানে বলা হয়েছে, “কৃষ্ণের বাম অঙ্গ থেকে এক কন্যা উৎপন্ন হয়েছে । গুরুজনেরা তার নাম রাখেন রাধা ।” (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ৫/২৫-২৬) আরও বলা হয়েছে, “সেই রাধার বিবাহ রায়াগ নামক একজন বৈশ্যর সঙ্গে দেওয়া হয় যিনি কৃষ্ণের মা যশোদার নিজের ভাই ছিলেন ।” (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ৪৯/৩৯, ৪১, ৪৯) কৃষ্ণের মা যশোদার নিজের ভাই রায়াগ এর সাথে রাধার বিবাহ হলে কৃষ্ণের নিজের মামী হচ্ছেন । সেইজন্য মামির সঙ্গে অবৈধ প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ ফেঁসে গিয়েছিলেন । এবং ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ’ এর ৪ নং খন্ডের ১৫ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে বহুবীর শ্রীকৃষ্ণ রাধার সঙ্গে সহবাস (ব্যভিচার) করেন । এবং এও বলা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বিবাহ করেছিলেন । (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, খন্ড-৪, ১১৫/৮৬-৮৮)

শ্রীকৃষ্ণের জঘন্য চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে পদ্মপুরাণের লেখক লিখেছেন যে রামচন্দ্র যখন দণ্ডক অরণ্যে পৌঁছলেন তখন তাঁর অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে সেখানে বসবাসকারী সমস্ত ঋষিরা রামচন্দ্রের সঙ্গে ব্যভিচার করার আকাঙ্ক্ষা পোষন করলেন । সেই সমস্ত ঋষিরা দ্বাপর যুগের শেষে গোপী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ হয়ে জন্মগ্রহণ করে গোপীদের সঙ্গে ব্যভিচার করেন যার দ্বারা গোপীরা মোক্ষ লাভ করেন ।

গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অবৈধ যৌন সম্পর্কের কথা বিষ্ণুপুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে,

“তাঃ বার্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিঃ স্তথা,
কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা রাত্রাং রময়ন্তি রতিক্রিয়া ।”

(বিষ্ণুপুরাণ, ৫, ১৩/৫৯)

অর্থাৎ সেই রমনকারী (ব্যভিচারী) গোপীরা নিজেদের স্বামী, পিতা এবং ভাইদের নিষেধ করা সত্ত্বেও রাত্রিবেলায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্যভিচার করত ।



শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যে গোপীদের অবৈধ সম্পর্ক ছিল তা ভাগবতেও স্পষ্টভাবে লেখা আছে । সনাতন বৈদিক হিন্দু ধর্মের ঈশ্বরের অবতার বলে মান্যকারী শ্রীকৃষ্ণের এই গ্রামের মা, বোন এবং গৃহবধূদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারী কিভাবে মানুষের জন্য আদর্শ হতে পারেন ?

শ্রী কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে শীতল বালুকাময় নদী পুলীন এর মধ্যে প্রবেশ করে ব্যাভিচার করতেন । সেই স্থান চাঞ্চল্যকর, সুগন্ধযুক্ত বায়ুতে আনন্দদায়ক মনে হচ্ছিল । বাহু প্রসারিত করা, আলিঙ্গন করা, গোপীদের হাত ধরে নেওয়া, চুল ধরে টানা, জংঘার উপর হাত বুলানো, স্তনে হাত দেওয়া, গোপীদের নরম শরীরে খামচে ধরা, তীর্থকভাবে দেখা, মস্করা করা প্রভৃতির মাধ্যমে গোপীদের কামলালসা জাগিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাভিচার করতেন । (শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ, ১০/২৯-৪৫)

শ্রীকৃষ্ণ সারা রাত জেগে নিজের সঙ্গীদের নিয়ে নিজের থেকে অধিক অবস্থাশালী মায়ের বয়সী মহিলাদের সঙ্গে ব্যাভিচার করতেন । (আনন্দ রামায়ণ, রাজ্য সর্গ, ৩/৪৭)

অত্যাধিক রমনীর সঙ্গে যৌনক্রিড়ায় মত্ত হয়েও শ্রীকৃষ্ণের কামলালসা পূর্ণ হয়নি । এর পরও মহাভারত ও বৈবর্তপুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের ১৬ হাজার ১ শত ৮টি স্ত্রী ছিল । এই হল সনাতন বৈদিক হিন্দু ধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের অবস্থা ।

দেবরাজ ইন্দ্রের কুকর্ম

গৌতম মুনির স্ত্রীর নাম অহল্যা । সদ্যস্নাতা এবং আদ্র বস্ত্র পরিহিতা অবস্থায় আশ্রমে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে গৌতম - শিষ্য দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে ।

আদ্র বস্ত্রের মিথ্যা আবরণকে ভেদ করে উদগত যৌবনা অহল্যার রূপ লাভ্য বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ফুটে উঠায় ইন্দ্রদেবের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে; তিনি গুরুপত্নী অহল্যার সতীত্ব হরণ করেন ।

ত্রিকালজ্ঞ গৌতম মুনির কাছে একথা অজ্ঞাত থাকে না; তাঁর অভিশাপে অহল্যা প্রস্তুরে পরিণত হন - আর ইন্দ্রদেবের দেহে ‘সহস্র যোনির’ উদ্ভব ঘটে । এটা দ্বাপর যুগের ঘটনা । সুদীর্ঘকাল পরে ত্রৈতাযুগে ঈশ্বরের অবতার রূপে শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হন - পদস্পর্শে অহল্যার পাষাণত্ব অপনোদিত হয় । (পদ্ম পুরাণ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬৯০)

যে সনাতন বা বৈদিক ধর্মের দেবরাজ ইন্দ্রই চরিত্রহীন, লম্পট সেই ধর্ম কোনদিন ঐশ্বরিক বা ইলহামী ধর্ম হতে পারে না।

ব্রহ্মার কুকর্ম

প্রজাপতি দক্ষের একশত পাঁচটি কন্যার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা সতীর বিবাহ হয়েছিল শূলপানি (মহাদেব শিব) এর সাথে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু সহ প্রায় সকল দেবতাই এই বিয়ে উপলক্ষে হাটকেশ্বর তীর্থে সমবেত হয়েছিলেন এবং দক্ষের অনুরোধে ব্রহ্মা বিয়েতে পৌরহিত্য করেছিলেন।

যজ্ঞানুষ্ঠান কালে বেদীতে উপবিষ্ট অবগুষ্ঠনগতি (ঘোমটা দেয়া) সতীর প্রতি ব্রহ্মার দৃষ্টি পতিত হলে চতুরানন (চারটি মুখ বিশিষ্ট) ব্রহ্মা সকলের অজ্ঞাতে সর্বশরীর দর্শন করেন। কিন্তু অবগুষ্ঠনের জন্যে মুখমণ্ডল দর্শনে ব্যর্থ হন। কৌশলে কার্যোদ্ধারের জন্যে তিনি যজ্ঞ-কুণ্ডে কাঁচা কাঠ নিক্ষেপ করতে থাকেন। ফলে প্রচণ্ড ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং বেদীর উপরে উপবিষ্ট সকলে ধোঁয়া থেকে চোখকে নিরাপদ করার জন্যে চোখ বন্ধ করেন।

বলা বাহুল্য ব্রহ্মা এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। সুতরাং সুযোগ বুঝে অবগুষ্ঠন উন্মোচন করত তিনি সতীর মুখমণ্ডল দর্শন করেন।

উল্লেখ্য ‘সর্বাঙ্গ’ দর্শন করা থেকেই তিনি কামাতুর হয়ে পড়েছিলেন। এখন মুখমণ্ডল দর্শনে অবস্থা চরমে উপনীত হওয়ায় বীর্যস্থলিত হয়ে বেদীর উপরে পতিত হয়। ব্রহ্মাও সাথে সাথে বালি দ্বারা বীর্যগুলো ঢেকে ফেলেন। কিন্তু বররূপী মহাদেবের দিব্যদৃষ্টির কাছে তা গোপন থাকে না।

নিজের স্ত্রীর উপরে ব্রহ্মার এই কামাতুর দৃষ্টি স্বাভাবিক রূপেই মহাদেবকে ক্রোধান্বিত করে তোলে। তিনি অভিশাপ দিতে উদ্যত হন। অবশেষে ব্রহ্মার ক্ষমা প্রার্থনায় ক্রোধ প্রশমিত হয়। তবে নিজের স্ত্রীর উপরে কামাসক্ত অবস্থায় স্থলিত ব্রহ্মার এই বীর্যকে ব্যর্থ হতে না দিয়ে তৎসংশ্লিষ্ট বালিসমূহকে তিনি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ (বৃদ্ধাঙ্গুলির সমান) ‘মুনিতে’ পরিণত করেন।

এইরূপ প্রতিটি বালিকণা থেকে এক এক করে মোট অষ্টাশীতি সহস্র মুনির উদ্ভব ঘটে এবং বালি থেকে উদ্ভূত বিধায় তাঁদের নাম রাখা হয় ‘বালখিল্য মুনি’। (স্কন্দ পুরাণ, নাগর খণ্ড, ৭৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

যে সনাতন বা বৈদিক ধর্মের ব্রহ্মাই চরিত্রহীন, লম্পট সেই ধর্ম কোনদিন ঐশ্বরিক বা ইলহামী ধর্ম হতে পারে না।

কার্তিকের জন্ম রহস্য

কার্তিক মহাদেবের পুত্র। মহাদেব স্বীয় পত্নী পার্বতীর সাথে রমণকার্যে নিরত থাকাকালে আকস্মাৎ সেখানে দেবগণের আবির্ভাব ঘটায় তিনি গাত্রোত্থান (পার্বতীর যৌনাঙ্গ থেকে শিব লিঙ্গ বের) করেন। ফলে বীৰ্য মাটিতে পতিত হয়। পৃথিবী তা ধারণে অক্ষম হয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ পরে। অগ্নি কর্তৃক বীৰ্য শালবনে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তা থেকে সেখানে এক শিশু জন্মলাভ করে। কৃত্তিকাগণ কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায় উক্ত শিশুর নাম রাখা হয় কার্তিকেয় বা কার্তিক। (শিব পুরান)

এছাড়াও পুরানে আছে, এক সময় ভগবান মহাদেব যখন তাঁর পত্নী পার্বতীর সাথে সহবাসে মিলিত হয়েছিলেন তখন মহাদেবের উত্তেজনার ফলে পার্বতী মরণাপন্ন হন এবং প্রাণরক্ষার জন্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে থাকেন। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সুদর্শন চক্রের দ্বারা উভয় লিঙ্গকে কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করত পার্বতীর প্রাণরক্ষা করেন।

দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পূর্বে উভয় লিঙ্গ যুক্ত অবস্থায় ছিল; দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরেও সেই অবস্থায় থেকে যায়। এই স্মৃতিকে জাগরুক রাখার জন্যই বাণলিঙ্গ পূজার উদ্ভব ঘটানো হয়েছিল।

এখন আমাদের প্রশ্ন মহাদেবের উত্তেজনা বশতঃ সহবাসের জ্বালা পার্বতী সহ্য করতে পারলেন না মরণাপন্ন হয়ে গেলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের দ্বারা উভয়ের লিঙ্গ কেটে দিলেন তবে কাটা যৌনাঙ্গ নিয়ে পার্বতী বেঁচে রইলেন কি করে? এটা কি বিজ্ঞান বিরোধী নয়? আর হিন্দুরা যদি বলে 'যেহেতু পার্বতী দেবী ছিলেন সেজন্য দৈব বলে বেঁচে গেছেন তাহলে আমরা বলব দৈব বলেই যদি পার্বতী বেঁচে যান তাহলে তিনি দৈব বলে মহাদেবের সহবাসের জ্বালা সহ্য করতে পারলেন না কেন? বাস্তববিরোধী বা বিজ্ঞান বিরোধী ধর্মই কি হিন্দু ধর্ম?

বিবাহ ও হিন্দু ধর্ম

ঐতিহাসিক ডক্টর অতুল সুর (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক/এম. এ. ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট) লিখেছেন, “ঋগ্বেদের সপ্তম মন্ডলে (৭/২/৫) বর্ণিত ‘সমন’ উৎসবের অনুষ্ঠান থেকে সায়ন ‘সমন’ শব্দের যে ভাষ্য দিয়েছেন তা থেকে মনে হয় ‘সমন’



উৎসবটা অনেকটা আজকের দিনের অলিম্পিক উৎসবের মত ।” এই উৎসবে কি হয় তা ঐতিহাসিক ডক্টর অতুল সুর জানিয়েছেন, “যুবতী মেয়েরা মনোমত পতিলাভের আশায় সুসজ্জিত হয়ে যোগদান করতো । এছাড়া বারাজনাগণও ধনলাভের আশায় সেখানে উপস্থিত থাকতো । সমস্ত রাত্রিব্যাপি এই উৎসব চলতো ।” ঐতিহাসিক ডক্টর অতুল সুর আরও লিখেছেন, “বৈদিক যুগের বিবাহ সম্বন্ধে আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, নবপরিণীতার বিবাহ কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে হোত না, তার সমস্ত সহোদর ভ্রাতাদের সঙ্গেই হোত । অন্ততঃ আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের যুগ পর্যন্ত এই রীতি প্রচলিত ছিল । কেননা, আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, কন্যাকে দান করা হয় কোন এক বিশেষ ভ্রাতাকে নয়, বংশের সমস্ত ভ্রাতাকে ।” (ভারতের বিবাহের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-২২ ও ২৩)

ঐতিহাসিক ডক্টর অতুল সুর আরও জানিয়েছেন, “ঋগ্বেদ এবং অথর্ববেদে এমন কয়েকটি স্তোত্র আছে যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যদিও বধুকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই বিবাহ করতো তাহলেও তার কনিষ্ঠ সহোদরগণেরও তার উপর যৌন মিলন বা রমণের অধিকার থাকতো । এই দুই গ্রন্থেই স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ‘দেব্’ বা দেবর বলা হয়েছে । এই শব্দদ্বয় থেকেও তা সূচিত হয় । কেননা ‘দেবর’ মানে দ্বিবর বা দ্বিতীয় বর ।”

ডক্টর অতুল সুর ‘ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়’ বইয়ের মধ্যে কাশ্মীরের লাদাখ মেয়েদের বহুপতি গ্রহণের ব্যাপারে লিখেছেন, “তাদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই বিবাহ করে, কিন্তু সেই বিবাহিতা স্ত্রী কনিষ্ঠ ভ্রাতাদেরও স্ত্রীরূপে পরিগণিত হয় ।” (পৃষ্ঠা-১১৭)

ঐতিহাসিক ডক্টর অতুল সুর আরও লিখেছেন, “বহুপত্নী গ্রহণও মহাভারতীয় যুগে বেশ প্রচলিত ছিল ।.....মহাভারতে একস্থলে উল্লিখিত হয়েছে, কৃষ্ণের ১০১৬ স্ত্রী ছিল । আবার অপর স্থলে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণের ১৬০০০ স্ত্রী ছিল । মহাভারতে আরও উল্লিখিত হয়েছে যে রাজা সোমকের একশত স্ত্রী ছিল ।.....পান্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহই একমাত্র বহুপতি গ্রহণের দৃষ্টান্ত নয় । কালান্তরে গৌতম বংশীয়া জটীলা সাতটি ঋষিকে একসঙ্গে বিবাহ করেছিলেন । আবার বাঙ্কী নামে এক ঋষিকন্যা একসঙ্গে দশ ভাইকে বিবাহ করেছিলেন ।.....দ্রৌপদীর বিবাহকালে ব্যাস বলেছিলেন, ‘স্ত্রী লোকের পক্ষে বহুপতি গ্রহণই সনাতন ধর্ম ।’ ধর্মসূত্র সমূহেও এর উল্লেখ আছে ।” (ভারতের বিবাহের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-২২ ও ২৩)

ঐতিহাসিক ডক্টর অতুল সুর আরও লিখেছেন, “বিবাহের পূর্বে মেয়েদের যৌনসংসর্গ মহাভারতের যুগে অনুমোদিত হোত । বোধহয় আগেকার যুগেও হোত । কেননা ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেখতে পাই যে, মহর্ষি সত্যকামের মাতা জাবালা



যৌবনে বহুচারিণী ছিলেন ।.....কুস্তীও কুমারী অবস্থায় সূর্যের সঙ্গে মিলনের ফলে পুত্র কর্ণকে প্রসব করেছিলেন ।” (ভারতের বিবাহের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-২২ ও ২৩)

ডক্টর অতুল সুর আরও লিখেছেন, “রামের বিবাহ যে ভগিনী সীতাদেবীর সঙ্গে হয়েছিল তা দশরথ জাতকেও উল্লিখিত হয়েছে ।.....স্বামী যদি বিদ্যা অর্জনের জন্য দেশান্তরে যায় তাহলে স্ত্রী দশ বা বারো বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে । যদি সেই স্ত্রী স্ববর্ণ কোন ব্যক্তি হতে পুত্র লাভ করে তাহলে তার অপবাদ বা দণ্ড হবে না ।” (ভারতের বিবাহের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৪৩)

ডক্টর অতুল সুর আরও লিখেছেন, “মেগাস্থিনিস তক্ষশীলায় যে প্রচলিত প্রথা থাকতে দেখেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে । তিনি বলেছেন, যাঁরা দারিদ্রের জন্য কন্যাকে সুপাত্রে দিতে পারেন না, তাঁরা যুবতী কন্যাদের হাটে নিয়ে গিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে জনতার সমাবেশ করান । যখন মধ্য থেকে কেহ বিবাহ ইচ্ছুক হয়ে এগিয়ে আসে, তখন কন্যাকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে তাকে নিরীক্ষণ করতে দেওয়া হয় । প্রথমে সে কন্যার পশ্চাৎভাগ নিরীক্ষণ করে, পরে নিরীক্ষণ করে তা সম্মুখভাগ । যদি কন্যাকে তার পছন্দ হয় তাহলে উপযুক্ত পণ দিয়ে সে তাকে নিয়ে যায় এবং স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করে ।” (ভারতের বিবাহের ইতিহাস)

ডক্টর অতুল সুর আরও লিখেছেন, “নরক থেকে পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করার জন্য পুত্র উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার উপর স্মৃতিকাররা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন । এই কারণে বিবাহিত জীবনে যদি সন্তান উৎপন্ন না হয়, কি নিঃসন্তান অবস্থায় যদি কেহ মারা যায়, তাহলে তার স্ত্রী বা বিধবার ‘ক্ষেত্র’ অপরের দ্বারা সন্তান উৎপাদনের বিধান স্মৃতিকাররা দিয়েছেন । এই ব্যবস্থাকে নিয়োগ বলা হত । ‘নিয়োগ’ আর কিছুই নয়, স্বামীর পরিবর্তে কোন নিযুক্ত ব্যক্তিকে উৎপাদকরূপে গ্রহণ করা ।.....‘নিয়োগ’ প্রথানুযায়ী মাত্র এক বা দুটি সন্তান পর্যন্ত উৎপন্ন করা যেত, তার অধিক নয় । মনু এবং গৌতম মাত্র দুটি সন্তান উৎপাদনেরই অনুমতি দিয়েছেন ।” (ভারতের বিবাহের ইতিহাস)

যে হিন্দু বা সনাতন বৈদিক ধর্মে মহিলাদের এই অবস্থা সেই ধর্ম কোনদিন ঐশ্বরিক ধর্ম হতে পারে না ।

হিন্দু মন্দিরগুলিতে জঘন্য কুকর্ম

পুরীর জগন্নাথের মন্দির একটি বিখ্যাত মন্দির । সেখানে জগন্নাথ দেব রয়েছেন । প্রতিদিন সেখানে হাজার হাজার লোক খাওয়ানো হয় । এই মন্দিরের



দেওয়ালে ৬৪ রকমের যৌন মিলন ভঙ্গীর ভাস্কর্য আছে । আছে জয় বিজয় তোরণে জগন্নাথ দেবের নানা ধরনের যৌনভঙ্গীর চিত্র ।

জগন্নাথ মন্দিরের সেবায় রয়েছে ১২০ জন দেবদাসী । এদের কাজ জগন্নাথের মূর্তির সামনে নৃত্য করা । সেই নৃত্য শুরু হয় রাত্রে । প্রতিদিন রাত ১০ টার পর মন্দিরে রুদ্ধকক্ষে জগন্নাথের নিষ্পাণ মূর্তির সামনে চলে ভজনের নৃত্য । প্রতি রাত্রেই নাচে এক একটি নতুন মেয়ে । মাঝে মাঝে বাজনা বাজায় পুরোহিত । শুধু পুরোহিত ছাড়া অন্য কারোর থাকার অধিকার নেই এই ঘরে । একরাত্রে শুধু একজনই নাচে । এক সময়ে এই নৃত্য চরমে উঠলে দেহের সমস্ত আচ্ছাদন খুলে ফেলে সেই মেয়েটি । নাচতে নাচতে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে । তারপর ? তারপরের ঘটনা রীতিমত রোমহর্ষক, সেই বিবজ্ঞা মেয়েটি নিজেকে সাঁপে দেয় জগন্নাথের মূর্তির কাছে । উত্তাল নৃত্যের সঙ্গে উৎকট উত্তেজনায় চিৎকার করতে থাকে - হে প্রভু, তুমি আমার সব । তুমিই ইহকাল, তুমিই পরকাল । আমি তোমার স্ত্রী । আমার এ দেহমন সবই তোমার । আমি আর পারছি না । তুমি আমাকে গ্রহণ কর । তারপর যা ঘটায় তাই ঘটে । কে এই বিবসনা যুবতীকে গ্রহণ করে ? জগন্নাথের প্রাণহীন মূর্তি না জীবন্ত পুরোহিত ? এইসব মেয়েদের শেষজীবন বড়ই করুন । যৌবন ফুরিয়ে গেলে এদের আর কোন কদর থাকে না । ওইসব চরিত্রহীন পুরোহিতদের কাছে তাই এরা বারাজ্ঞনাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয় শেষ বয়সে । আর এই সব দুশ্চরিত্র দুষ্ট অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্যই মনে হয় মন্দিরের গায়ে অতসব যৌন মিলনের ভাস্কর্য রয়েছে । (তথ্যসূত্র : ডক্টর অতুল সুর)

শ্রী অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী লিখেছেন, “মন্দির আমাদের কাছে পবিত্রস্থান । কিন্তু নানারকম অপবিত্র কাজই সংঘটিত এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে । কালিঘাটের কালি মন্দিরের পাশেই পতিতালয়.....। তারাপীঠের মন্দিরের চারপাশের হোটেলগুলোতে খোঁজ নিলে দেখা যাবে ভক্তের চেয়ে ভন্ডের সংখ্যাই বেশী । যৌন সঙ্গমের জন্য প্রচুর নরনারীর ভিড় সেখানে ।” (ধর্মের নামে, পৃষ্ঠা-৪৮)

তারকেশ্বরের জন্য অলোকবাবু লিখেছেন, “দেখা যাক এত ভিড় হয় কেন সেখানে । এই মন্দিরের চারপাশেও ঘরভাড়া দেওয়া হয় সম্ভোগের জন্য । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাভারাই সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেয় ।” (ধর্মের নামে, পৃষ্ঠা-৪৮)

অলোকবাবু আরও লিখেছেন, “এটি কেরালার চেন্নানন্দের কালীমন্দির । ধূর্ত পুরোহিত এমন নোংরা কাজ করেছিল যা কল্পনাও করা যায় না ।....হঠাৎ একদিন সেই পুরোহিত ঘোষণা করে কালিমন্দিরে মা কালীর প্রতিমাসে রক্তস্রাব হচ্ছে । আর সেই রক্তে ভেজা ন্যাকড়া সব রোগ সারিয়ে দেয় । সে কি ভীড় মন্দিরে; অন্ধবিশ্বাসী ভক্তদের মধ্যে সেই ন্যাকড়া বিতরণ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ঐ শয়তান পুরোহিত । আসলে



সে তার স্ত্রী ও তার মেয়ের মাসিক ঋতুস্রাবে ব্যবহৃত ন্যাকড়া খন্ড খন্ড করে অন্ধ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করত ।” (ধর্মের নামে, পৃষ্ঠা-৫০)

অলোকবাবু আরও লিখেছেন, “বিশ্ববিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরের কথা কে না জানে । ঐতিহাসিক এই মন্দিরে ছিল কুবেরের ঐশ্বর্য । একদা এই বিপুল ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন গজনির সুলতান মামুদ । লুণ্ঠন ছাড়া তিনি আর এক উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন এখানে । তাই সঙ্গে এনেছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, ধাতুবিদ আর বিজ্ঞানীদের ।.....সে এক অদ্ভুত ব্যপার । শূন্যে ভেসে থাকত সোমনাথ দেবের মূর্তি ।.....পরীক্ষা করে দেখা যায় শূন্যে ঝুলন্ত দেবমূর্তিটি লোহার তৈরী । বিশেষজ্ঞদের অভিমত - মন্দিরের দেওয়ালের চারপাশে চুম্বক পাথর বসানো আছে । আর সেগুলো এমন ভাবে বসানো যে লোহার মূর্তিটি ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় ছেড়ে দিলে চারদিকে চুম্বক আকর্ষণে সেটা ঝুলে থাকতে বাধ্য । প্রমাণ পাওয়া গেল মন্দিরের দেওয়ালের পাথর খোলবার পর । সত্যিই দেখা গেল চুম্বক রয়েছে ভেতরে । আর চুম্বকে হাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শূন্যে ভাসমান মূর্তিটি পড়ে গেল মাটিতে ।” (ধর্মের নামে, পৃষ্ঠা-৫১)

বিপুল ঐশ্বর্যের ভান্ডার তিরুপতি মন্দিরের বর্তমান রোজগার সোমনাথ মন্দিরের অতীতের উপাৰ্যনকেও ছাড়িয়ে গেছে ।.....শোনা যায় মন্দিরের মাসিক আয় তিন কোটি টাকার উপর । অর্থাৎ রোজ ১০ লাখ টাকারও বেশী । বিশেষভাবে বিবাহিতা নারীদের সতীত্ব নষ্ট করার ব্যপারে এদের জুড়ি মেলা ভার । কিভাবে এইসব লম্পট চরিত্রহীন পুরোহিতরা ধর্মবিশ্বাসী সরল নারীদের সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয় সেই কাহিনী অলোকবাবু লিখেছেন ডক্টর অতুল সুরের উদ্ধৃতি দিয়ে, “অনেক সময় ধর্মে র রূপ দিয়ে কামাচারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা বিবাহিত নারীদের প্রলুব্ধ করত, তাদের সতীত্ব বিসর্জন দিত । দেবতার আশ্চর্য শক্তি আছে স্ত্রীলোকদের বন্ধতা দূর করবার । এরূপ মন্দিরের মধ্যে কণাটক দেশের তিরুপতি মন্দির বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ । এখানকার দেবতা ভেনকাটেশ্বরের কাছে অসংখ্য স্ত্রীলোক আসে সন্তান কামনায় । পুরোহিতগণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তারা মন্দিরে রাত্রিযাপন করে । পুরোহিতগণ তাদের বলে যে তাদের ভক্তির দ্বারা প্রীত হয়ে ভেনকাটেশ্বরের রাত্রে তাদের কাছে আসবে এবং তাদের গর্ভবতী করে দিয়ে যাবে । তারপর যা ঘটত তা না বলাই ভাল । পাঠক তা সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন । পরদিন প্রভাতে এই সকল জঘন্য চরিত্রের ভন্ড তপস্বীরা কিছুই জানেনা এরূপ ভান করে ঐ সকল স্ত্রীলোকদের কাছে এসে দেবতার করুণা লাভ করেছে বলে তাদের পুণ্যবতী আখ্যা দিয়ে তাদের কাছ হতে দান গ্রহণ করত । দেবতার সঙ্গে তাদের যৌনমিলন ঘটেছে এই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে এই সকল হতভাগিনী নারীরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেত ।” (ধর্মের নামে, পৃষ্ঠা-৫২)

অলোকবাবু আরও লিখেছেন, “মোদাকথা ব্যাপারটা আসলে ধর্মের নামে লোক ঠকানোর ব্যবসা। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ২২০০ বছর আগে লেখা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। মিথ্যা প্রচার চালিয়ে সরল বিশ্বাসী মানুষদের স্বেচ্ছা প্রতারণা করা হত। যেমন ‘কোনও প্রসিদ্ধ পুণ্যস্থানে ভূমিভেদ পূর্বক দেবতা নির্গত হইয়াছেন, এই ছলে সেখানে রাত্রিতে বা নির্জনে একটি দেবতার বেদী স্থাপন করিয়া এবং এই উপলক্ষে উৎসাবাদি ও মেলা বসাইয়া সেই স্থানে শ্রদ্ধালু লোকের প্রদত্ত ধন দেবতাদ্বারা গোপনে রাজসমীপে অর্জন করিবেন।” (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ৫ম অধিকরণ, ২য় অধ্যায়, ৯০ তম প্রকরণ) ঐ গ্রন্থেরই ৯০ তম প্রকরণে একথাও আছে, “দেবতাদ্বারা (অর্থাৎ প্রধান পুরোহিত স্থানীয় ব্যক্তি) ইহাও প্রচার করিতা পারেন যে উপবনে একটি বৃক্ষ অকালে পুষ্প ও ফলযুক্ত হইয়াছে।” (ঐ, পৃষ্ঠা-৫৯) ‘ধর্ম ও কুসংস্কার’ পুস্তকে সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা হতে লেখক লিখেছেন, “বন্ধা রমণী দেবতারদের কাছে মানত করতেন তাঁর সন্তানাদি হলে তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রথমটিকে দান করবেন। এভাবে প্রথম সন্তানকে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে বিসর্জন দেয়া হত।”

এছাড়াও মহাভারতের ‘যযাতি উপাখ্যানে’ আমরা ঋষি গালকের বৃত্তান্ত পাই। রাজা যযাতি ঋষি গালবকে তাঁর প্রার্থিত উপার্যনের উপায়নস্বরূপ কন্যা মাধবীকে তাঁর হাতে দান করেছিলেন। মাধবী পর্যায়ক্রমে তিনজন রাজা, একজন ঋষির শয্যাভগিনী হয়ে চারটি পুত্র প্রসব করে গালবের প্রার্থিত অর্থ উপার্যন করেছিলেন। কোন ধর্মীয় আখ্যা দিয়েও এ ঘটনার নৃশংস বর্বরতাকে চাপা দেওয়া যায় না।

ড. রাধাকমল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “পুরীর সঙ্করাচার্য নিরঞ্জনদেব তীর্থ বলিয়াছেন : অস্পৃশ্যগণ হিন্দু নহে। অথচ কি আশ্চর্য সংবিধান বলিতেছে অস্পৃশ্যগণ হিন্দু। ‘মনুস্মৃতি’ (হিন্দুদের মূলশাস্ত্র) অনুযায়ী শূদ্রগণ কাক, ব্যাঙ, পাতিহাঁস, ছোঁচা, কুকুর ও ভবঘুরে পশুদের সামিল ও অশুদ্ধ। শূদ্রদিগের ধনসম্পদ বঞ্চনা করিয়া লইবার অধিকার উচ্চবর্ণের মানবের আছে। শূদ্রগণকে সম্পদ সঞ্চয়ের, স্বনির্ভর বা স্বাধীন ভাবে চলার কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই। (পৃ. ৪৪) এই বিংশ শতাব্দীতে যখন দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তখনও ভারতের বহুস্থানে অধ্যাবধি নিম্নবর্ণের লোকগণকে জুতা মাথায় তুলিয়া পথ চলিতে বাধ্য করা হয়। হোটেলের রেস্টোঁরায় এখনও তাহাদের জন্য আলাদা বাসন রাখা হয়। খাওয়ার পর তাহাদের দ্বারা ধোয়াইতে বাধ্য করে (পৃষ্ঠা-১৫)। কোন শূদ্র ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা কাটিয়া দেওয়া হইবে। কোন শূদ্র যদি উচ্চবর্ণের লোকের সমমর্যাদা ধারণ করে তবে তাহাকে প্রকাশ্য রাজপথে বেত্রাঘাত করিতে হইবে (অপস্তম্ব ধর্মসূত্র ৩-১০-২৬ শ্লোক) আর সে (শূদ্র) যদি বেদমন্ত্র মুখস্ত করিয়া রাখে তাহার দেহ টুকরো টুকরো করিয়া কতন করিতে হইবে।” (OH YOU HINDU AWAKE এর বঙ্গানুবাদ, পৃষ্ঠা-১৭)



হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান বিরোধী কথা

OH YOU HINDU AWAKE বইয়ের ড. রাধাকমল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “হিন্দু নরসিংহ পুরাণের ১৬৯ পৃষ্ঠা প্রমাণ করে যে, পৃথিবী চ্যাপ্টা। বরাহ অবতার নাসিকার অগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীকে মাদুরের মত মুড়াইয়াছেন। এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবী গোলাকার।”

তিনি আরও লিখেছেন, “বিষ্ণুপুরাণ বলে যে, সূর্য পৃথিবী হইতে ৮ লক্ষ মাইল এবং চন্দ্র ২২ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। নক্ষত্রবিদ্যা প্রমাণ করিয়াছে চাঁদ পৃথিবী হইতে ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল এবং সূর্য ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। কোথায় ৮ লক্ষ আর কোথায় ৯ কোটি !!” (পৃষ্ঠা-৪৬)

তিনি আরও লিখেছেন, “শত্ৰীয়া পুস্তক মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী পৃথিবীর আয়তন ৪ বৃন্দ অর্থাৎ ৪০০ কোটি বর্গমাইল। হায়! কোথায় ৪০০ কোটি আর কোথায় ১৯ কোটি!” (পৃষ্ঠা-৪৭)

তিনি আরও লিখেছেন, “বেদ-পুরাণ বলে যে দৈনিক সূর্যোপসনা করা দরকার এবং রোজ সূর্যের দিকে খালি চোখে তাকাইয়া থাকিলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যাহারা এইরূপ করিয়াছিল তাহাদের চোখ এখন অন্ধ। আর এই জন্যই ভারতে সবচেয়ে বেশী অন্ধ লোক। সূর্য বা উপাসনায় কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নাই। বরং বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারগণ খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকাইতে মানা করেন। কাহারা সত্য বলিতেছে, ডাক্তারগণ না হিন্দুশাস্ত্র?” (পৃষ্ঠা-৪৮)

বেদের মধ্যে আছে, “যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ় যেন স্ব স্তাভিতং যেন নাকঃ। যোহন্ত রিক্ষে রজৎসা বিমানঃ.....” (ঋগ্বেদ মন্ডল ১০। সূত্র ১২১/৫ম)

অর্থাৎ তেজস্কর দুলোক ও পৃথিবী যাহার দ্বারা স্থির (দৃঢ়) রয়েছে যেন স্ব-স্থান থেকে নড়াচড়া না করে। সূর্যকে যিনি তার কক্ষে ধারণ করে আছেন; যিনি মুক্তিদাতা, যিনি অনন্ত শূন্য লোক লোকান্তরসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী।



নিচের স্ক্রীন শটটি লক্ষ্য করুন

৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায় ।] ঋগ্বেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১১১ সূক্ত ।

আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ।

২। যিনি জীবাত্মা দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, যাহার আত্মা সকল দেবতার মন্য করে। যাহার দ্বারা অমৃতস্বরূপ, মৃত্যু যাহার বশভাণ্ড। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ।

৩। যিনি নিজ মহিমা দ্বারা যাবতীয় দর্শনোজ্জ্বলসম্পন্ন গতিশক্তি-ব্রহ্ম জীবদিগের অবিভীত বান্ধা হইয়াছেন, যিনি এই সকল মিশ্রণ চতুশ্চন্দ্রের প্রভু। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ।

৪। যাহার মহিমা দ্বারা এই সকল বিশ্বাত্মক পূর্ণত উৎপন্ন হইয়াছে(২), সমাগরা ধরা যাহারই অক্ষি বসিরা উল্লিখিত হই, এই সকল দিক দিকি যাহার বাহুব্রহ্ম। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ।

৫। এই সমুদ্রত আকাশ ও এই পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি অর্গলোক ও নাগলোকে(৩) স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অন্তরীক্ষলোক পরিমাণ করিয়াছেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ।

৬। দ্যাবাপৃথিবী সশব্দে যাহাকর্তৃক স্তম্ভিত ও উল্লাসিত হইয়াছিল, এবং সেই দীপ্তিশীল দ্যাবাপৃথিবী যাহাকে মন মনে মহিমা দ্বিত বৈদ্য রুবিতে পারিল, যাহাকে আশ্রয় করিরা সূর্য উদয় ও দীপ্তিবৃত্ত করেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ।

৭। ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভূবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহার গর্ভ ধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল; তাহা হইতে দেবতাদিগের এক বংশ প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ।

(২) মূল "হিমবতঃ" আছে।—"Snowy Mountains."—Max Muller.
(৩) মূল "অঃ" এবং "নগক" এই শব্দ আছে। "He through whom the heaven was established,—say, the highest heaven."—Max Muller.

১১২৩

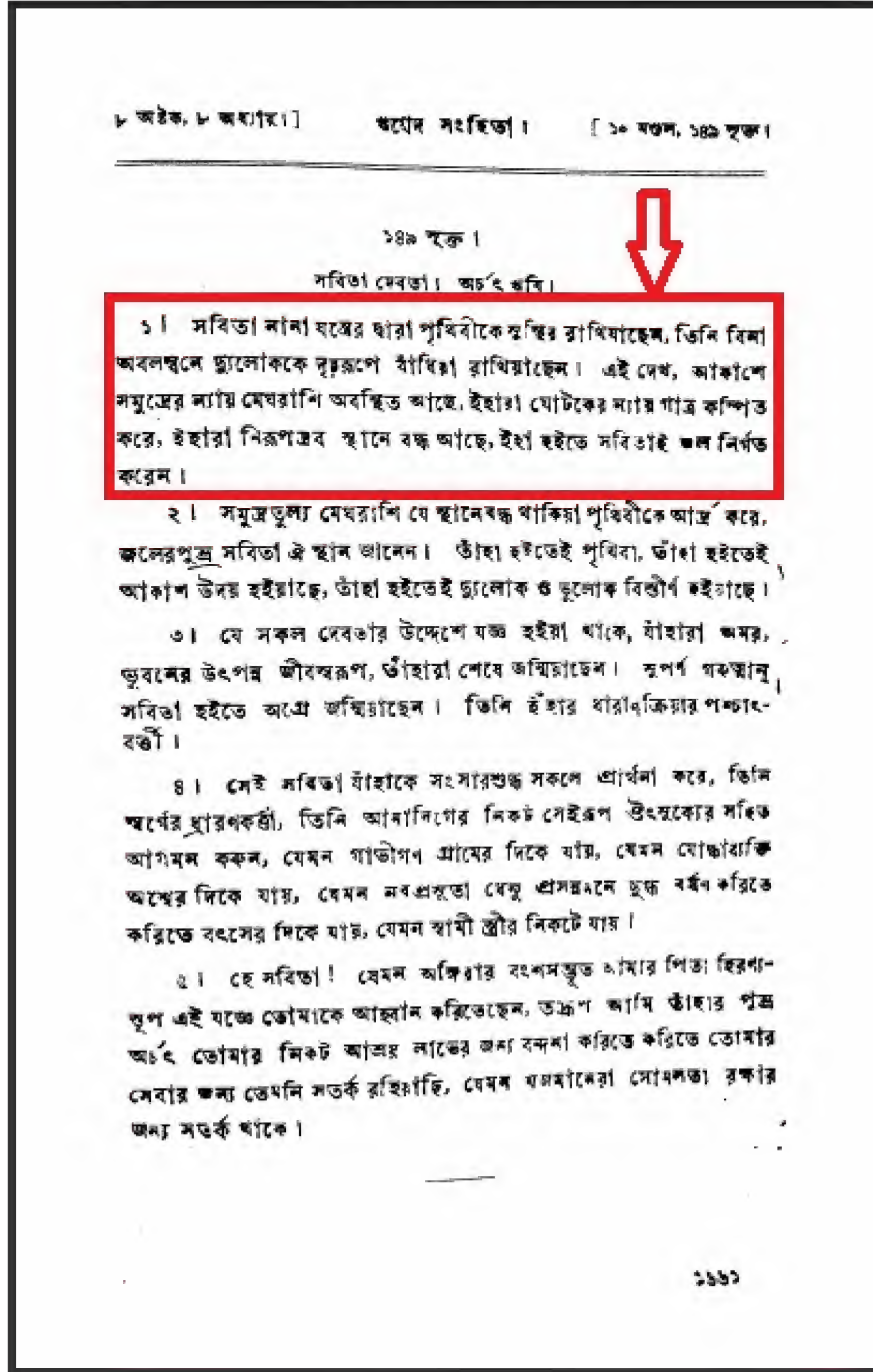
“সবিতা যন্ত্ৰেঃ পৃথিবীমরন্না - দন্ধন্তনে সবিতা দ্যামদং হত”

(ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ । সূত্র ১৪৯/১)

অর্থাৎ সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা (পর্বতমালার দ্বারা) পৃথিবীকে সুস্থির রেখেছেন - তিনি বিনা খুঁটিতে আকাশকে দৃঢ়রূপে ধারণ করেছেন ।



নিচের স্ক্রীন শটটি লক্ষ্য করুন



“যো অক্ষেনেব চ ক্রিয়া শচীভি-বিশ্বক ত স্তম্ভ পৃথিবীমুত দ্যাম”

(ঋগ্বেদ মন্ডল ১০। সূত্র ৮৯/৪)

অর্থাৎ সে ইন্দ্র নিজ শক্তি দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীকে ধরে রেখেছেন। (যেন নড়চড় না করে)



নিচের স্ক্রীন শটটি লক্ষ্য করুন

১- অষ্টক, ৪ অধ্যায়।] ঋগ্বেদ সংহিতা। [১০ বস্তু, ৮৯ সূত্র।

করিলেন বটে, কিন্তু বস্তু অনুষ্ঠানকারীদের মধ্যে কে ঐ প্রার্থের নির্ণয় করতে পারে।

১৮। হে শিবুগণ! তোমাদের নিকট তর্ক বিতর্কের কথা কহিতেছি না, কেবল উক্তরূপে আনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অগ্নি কর জন, সূর্য্য কর জন, উষা কর জন, জলইবা, অর্থাৎ জলদেবীইবা কর জন।

১৯। হে বায়ু! যে পর্য্যন্ত রাত্রিগণ উষার মুখের আচ্ছাদন স্থলিয়া না যেন, তখনই নিম্নস্থিত পার্থিব অগ্নি আদিরা যজ্ঞের নিকটে স্থান গ্রহণ করেন, তিনি হোতা, তিনিই স্তোত্রকারী।

৮৯ সূত্র।

ইন্দ্র দেবতা। বেণু কবি।

১। সকল অব্যক্তের প্রধান ইন্দ্রকে স্তব কর। তাঁহার মহিমা পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত সকলের ভেজঃ ছীন করিয়াছে। তিনি মনুষ্যাদিকে ধারণ করেন, তাঁহার মহিমা সমুদ্র অপেক্ষা অধিক, তাঁহার ভেজঃ সমস্ত সংসার পরিপূর্ণ করে।

২। বীৰ্য্যবান্ ইন্দ্র আপনার ভেজঃ সমস্ত তেমনভাবে চতুর্দিকে ঘূর্ণিত করিতে থাকেন, যেমন রথী চক্র ঘূর্ণিত করে। কৃষ্ণবর্ণ অশ্বকার সমস্ত যেন একটি অশ্বারী ও অদৃশ্য বস্তিরূপে, তাহাকে ইন্দ্র আপন জ্যোতিঃধারা নষ্ট করেন।

৩। হে স্তবকারী! আমার সমিত মিলিত হইয়া সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে এরূপ একটি নূতন স্তব উচ্চারণ কর, যাহা দিকৃষ্ট না হয়, যাহা পৃথিবী ও স্বর্গে উপমারহিত হয়। তিনি বস্তু উচ্চারিত স্তবগুলি পাইবার জন্য যেরূপ ইচ্ছুক হইলেন; শত্রুদিগের দর্শন পাইবার জন্যও তদ্রূপ ব্যস্ত হইলেন। তিনি বস্তুকে অনুসন্ধান করেন না, অর্থাৎ অনিষ্ট করিবার জন্য অনুসন্ধান করেন না।

৪। ইন্দ্রকে অকাতরে স্তব করা হইগাঁজে, আকাশের সন্তক হইতে জল আর্দ্রায়ন করিয়াছি, যেমন অশ্বারী চক্রে ধারিত হয়, তদ্রূপ সেই ইন্দ্র নিজ কাণ্ডের দ্বারা স্থানলোক ও তুলোককে উদ্ভবিত করিয়া রাখেন।

“ধ্রুবা দৌধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে” (ঋগ্বেদ মন্ডল ১০। সূত্র ১৭৩/৪)

অর্থাৎ আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল ও সমস্ত পর্বতও নিশ্চল।



নিচের স্ত্রীন শাটটি লক্ষ্য করুন

৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়। ঐশ্বর্য সংহিতা। [১০ বসন্ত, ১৭০ সূক্ত।]

৩। এই দেখ, আমর। অরুর সংগ্রহ করিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র দান করিতে উদ্যত হইয়াছি, স্বতন্ত্র ন্যায় এই বস্ত্র বিস্তার করিতেছি, তোমাকে বস্ত্র দিতেছি।

৪। তুমি আপনাত্ত গণিণী রত্নবীর অঙ্গকার নষ্ট করিলেন। ঐকৃষ্ট-রূপে হুঁকি প্রাপ্ত হইয়া রথ চালাইলেন।

১৭৩ সূক্ত।

রাজস্বতি দেখত। পূর্য করি।

১। হে রাজন! তোমাকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিলাম। তুমি এই জনপদের মধ্যে প্রভু হও; অটল, অবিচলিত, স্থির হইয়া থাক। তবৎ প্রজাগণ তোমাকে বাহুল্য করুক। তোমার রাজত্ব যেন নষ্ট না হয়।

২। তুমি এই স্থানেই পার্বতের ন্যায় অবিচলিত হইয়া থাক, রাজ্যভূক্ত হইও না। ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চল হইয়া এই স্থানে থাক। এই স্থানে রাজ্যকে ধারণ কর।

৩। অক্ষর হোমব্রত পাইয়া ইন্দ্র এই মনোভিহীন রাজাকে আশ্রয় দিয়াছেন। সেম তাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। ব্রহ্মন্যস্তি আশীর্বাদ করিয়াছেন।

৪। আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এই সমস্ত পার্বত নিশ্চল; এই বিশ্বভূগণ নিশ্চল; ইনিও প্রজাপিগের মধ্যে অবিচলিত রাজা হইলেন।

৫। বরুণরাজা তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুন, দেব রূহপাত অবিচলিত করুন, ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিতরূপে ধারণ করুন।

৬। এই দেখ অক্ষর হোমব্রতসহকারে অক্ষর হোমব্রতকে সংযোজিত করিতেছি, অতএব ইন্দ্র তোমার প্রজাপিগকে একায়ত্ত ও করপ্রদানোন্মুখ করিয়াছেন(১)।

(১) এই সূক্ত রাজাকে জন্মিত করিয়া দয়। এষ্টীও আশুদিক।

১৭৭৮

বেদের এই শ্লোকগুলিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে পৃথিবী নিশ্চল বা স্থির অথচ বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে প্রমাণ হয়ে গেছে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করছে। সুতরাং বিজ্ঞান বিরোধী বক্তব্য বেদে থাকায় কোনোদিন তা ঐশ্বরিক বা ইলহামী গ্রন্থ হতে পারে না। কেননা আল্লাহ বিজ্ঞান বিরোধী বক্তব্য দিতেই পারেন না। তাই বেদ ভন্ড মুনি ঋষির লেখা কাল্পনিক গ্রন্থ হতে পারে আল্লাহর বানী হতে পারে না।



কুরআন শরীফে আছে, “লাস শামসু ইয়ামবাগী লাহা আন তুদরীকাল ক্বামারা কুল্লুন ফি ফালাকিই ইয়াসবাহ্ন”

অর্থাৎ আকাশের মধ্যে সবকিছুই পরিভ্রমণ করছে।

সূতরাং বিজ্ঞানের সঙ্গে কুরআনের সামঞ্জস্য আছে কিন্তু বেদের সঙ্গে তা নাই। তাই কুরআন আল্লাহর বানী আর বেদ মানুষের লেখা কাল্পনিক গ্রন্থ।

‘মনুসংহিতা’য় যা আছে

মনুসংহিতায় লেখা আছে, মনু বলেছেন,

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমপক্ষনম্ ।
অপ্রতর্ক্যবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ॥ ৫ ॥

অর্থ : (প্রলয়কালে) এই (পরিদৃশ্যমান জগৎ) অন্ধকারাচ্ছন্ন, অপ্রজ্ঞাত, লক্ষণহীন, অননুমেষ ও অবিজ্ঞেয় ছিল; যেন সব দিকে (জগৎ) ছিল নিদ্রিত।

ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্কো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্ ।
মহাভূতাদিবৃভৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোদুদঃ ॥ ৬ ॥

অর্থ : তারপর (প্রলয়ান্তর) ভগবান, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অপ্রতিহত শক্তিসম্পন্ন, তমোদুদ স্বয়ম্ভু এই মহাভূতাদি ব্যক্ত করে আবির্ভূত হলেন।

যোহসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সুক্ষ্ণোহব্যক্তস্নাতনঃ ।
সর্বভূতময়য়োহচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥ ৭ ॥

অর্থ : ঐ যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সুক্ষ্ম, অব্যক্ত, শাস্বত, সকল জীবের আত্মা এবং অচিন্তনীয়, তিনি নিজেই (মহৎ প্রভৃতি কার্যরূপে) আবির্ভূত হলেন।

সোহভিধ্যায় শরীরাত্ স্বাত্ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥ ৮ ॥

অর্থ : তিনি নিজদেহ থেকে নানাবিধ মানুষ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে ধ্যানপূর্বক প্রথমে জলই সৃষ্টি করলেন, তাতে (নিজের শক্তিরূপ) বীজ নিক্ষেপ করলেন।

তদন্তমভবদ্বৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ॥ ৯

অর্থ : সেই বীজ সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সুবর্ণ অভ হল । সকল লোকের পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং তাতে জন্মগ্রহণ করলেন (অর্থাৎ শরীর ধারণ করলেন) ।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নবসুনবঃ
তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়নঃ স্মৃত ॥ ১০

অর্থ : জলকে বলা হয় নারা, জল নরের অপত্য । সেই জল যেহেতু পূর্বে তাঁর (নরের) আশ্রয় ছিল, সেইজন্য তিনি নারায়ন নামে অভিহিত হন ।

যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে ॥ ১১

অর্থ : যে (পরমাত্মা) [সৃষ্ট বস্তুর] কারণ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, শাস্বত, যিনি সৎও বটেন অসৎও বটেন; তাঁর উৎপাদিত সেই পুরুষ, পৃথিবীতে ব্রহ্ম নাম ঘোষিত হন ।

তস্মিন্নভ্বে স ভগবানুষিত্ব পরিবৎসরম্
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাত্তদন্তমকরোদ্বিধা ॥ ১২

অর্থ : সেই ভগবান সেই অভ্বে এক বৎসর বাস করে নিজেই নিজের ধ্যানবলে সেই অভ দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন ।

তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্মমে
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাস্বতম্ ॥ ১৩

অর্থ : সেই খন্ড দুটি দ্বারা তিনি স্বর্গ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন; মধ্যভাগে আকাশ, আট দিক্ ও জলের শাস্বত স্থান (অর্থাৎ সমুদ্র) সৃষ্টি করেছিলেন ।

এখানে ৫ নং শ্লোকে বলা হয়েছে সৃষ্টির শুরুতে মহাপ্রলয় হয়েছিল এবং (পরিদৃশ্যমান জগৎ) অন্ধকারাচ্ছন্ন, অপ্রজ্ঞাত, লক্ষণহীন, অননুমেষ ও অবিজ্ঞেয় ছিল; যেন সব দিকে (জগৎ) ছিল নিদ্রিত আবার ৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে ধ্যানপূর্বক তিনি প্রথমে জল সৃষ্টি করলেন “তিনি নিজদেহ থেকে নানাবিধ মানুষ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে ধ্যানপূর্বক প্রথমে জলই সৃষ্টি করলেন, তাতে (নিজের শক্তিরূপ) বীজ নিক্ষেপ



করলেন ।” ৮ নং শ্লোকের সৃষ্টিকার্য ৫ নং শ্লোকের সৃষ্টিকার্যের পরা সংঘটিত হয় । তহলে যে বলা হয়েছে সৃষ্টির শুরুতে যে প্রলয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে সেটি কি জল ছাড়াই হয়েছে ? জল ছাড়া প্রলয় কিভাবে সম্ভব ?

মনুসংহিতায় আরও বলা হয়েছে,

লোকানান্ত বিবৃদ্ধার্থং মখুবাহরুপাদতঃ
ব্রাস্তনং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যাং শুদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ং । ৩১

অর্থ : লোকবৃদ্ধির জন্য (স্রষ্টা) মুখ, বাহু, উরু ও পদ থেকে ব্রাস্তন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্টি করলেন ।

দ্বিধা কৃত্বাত্মানো দেহমর্ধেন পুরুষোহবৎ
অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভৃ । ৩২

অর্থ : সেই প্রভৃ নিজদেহ দ্বিধা বিভক্ত করে অর্ধভাগে পুরুষ হলেন, (অপর) অর্ধ হল নারী; তাতে তিনি বিরাট (পুরুষকে) সৃষ্টি করলেন ।

তপস্তপত্বাসৃজদযন্ত স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্
তং মাং বিভাস্য সর্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ । ৩৩

অর্থ : হে ব্রাস্তনগণ, সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করে যাকে সৃষ্টি করেছিলেন, সকলের স্রষ্টা আমাকে (অর্থাৎ মনুকে) তিনি বলে জানুন ।

অহং প্রজাঃ সিস্কুস্তু তপস্তপত্বা সুদুশ্চরম্
পীতন প্রজানামসৃজনং মহষীনাদিতো দশ । ৩৪

অর্থ : আমি (মনু) লোক সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে অতি কঠোর তপস্যা করে প্রথম থেকে দশ জন প্রজাপতি মহষীকে সৃষ্টি করেছিলাম ।

এই হল মনুসংহিতার অবস্থা । সৃষ্টি সম্পর্কে এত ভুল ভাল তথ্যে তা পরিপূর্ণ ।

পদ্মপুরানে আছে, “আদিতে পৃথিবীর কোন আকার ছিল না । চারিদিকে জল দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল ।



-অনাদির আদি শ্রীহরি বটের পাতার তৈরী শয্যায় শয়ন করে সেই জলের উপর ভাসতে লাগলেন । আর মহালক্ষ্মী বসলেন শ্রীহরির পদসেবা করতে ।

-শ্রীহরির দুই কর্ণমল হতে সহসা একদিন জন্মগ্রহণ করল বলশালী দুই দৈত্য - মধু ও কৈটভ । চিৎকার করে তারা শ্রীহরির নিদ্রা ভঙ্গ করল ।

-ব্রহ্ম দৈত্য ভয়ে শ্রীহরির নাভিপদ্মে আত্মগোপন করলেন এবং মহামায়ার সাহায্য প্রার্থনা করলেন । এরপর শ্রীহরির সঙ্গে ৫০ হাজার বছর যুদ্ধ চলল দৈত্যদ্বয়ের ।

-শ্রীহরি দৈত্যদ্বয়কে পরাস্ত করলেন । দৈত্যদ্বয়ের মেদ থেকে সৃষ্টি হল পৃথিবী বা মেদিনী ।

-শ্রীহরির নাভী থেকে ব্রহ্মা, হৃদয় থেকে বিষ্ণু ও ললাট থেকে শিব আবির্ভূত হল ।”

এখানে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় পদ্মপুরাণে জগৎসৃষ্টি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার পুরো ব্যাপারটাই গোলমেলে ব্যাপার । জগৎসৃষ্টির আগে চারিদিকে জল ছিল এটা অবশ্যই মানতে হবে কেননা জলই জীবন । জল থেকেই সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে । তবে এখানে যে বলা হয়েছে শ্রীহরি বটের পাতার সাহায্যে ভাসতে লাগলেন এটা কি করে সম্ভব ? যখন বটগাছই শ্রীহরি সৃষ্টি করেন নি তখন বটের পাতা এল কোথা থেকে ? এরপর এখানে লেখা আছে মহালক্ষ্মী শ্রীহরির পদসেবা করছিলেন । এখানে মহালক্ষ্মী কোথা থেকে এলেন ? মহালক্ষ্মী তো দেবী দুর্গার কন্যা এবং ব্রহ্মার স্ত্রী । জগৎসৃষ্টির আগেই কি শ্রীহরি মহালক্ষ্মীকে সৃষ্টি করেছিলেন ? এটা কি বিজ্ঞান বিরোধী বক্তব্য নয় ? এখানেই গল্প শেষ নয় । এরপর বলা হয়েছে শ্রীহরির দুই কানের ময়লা থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য সৃষ্টি হল । এবং তারা চিৎকার করে শ্রীহরির নিদ্রা ভঙ্গ করে দিল । এটা কি করে সম্ভব যে সহসা দুই দৈত্য সৃষ্ট হয়ে গেল আর শ্রীহরি তা জানতেই পারলেন না । আর এদিকে দেখা যায় শ্রীহরি ঘুমোচ্ছিলেন । তাহলে দেখা যায় হিন্দুদের মতে স্রষ্টাও ঘুমোন এবং সৃষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞ । তাঁর অজান্তেই অনেক কিছু সৃষ্ট হয়ে যায় । বৈদিক বা সনাতন হিন্দু ধর্মের স্রষ্টাই যদি ঘুমোন তাহলে সৃষ্টির অবস্থা কি হবে সৃষ্টির দায়িত্ব কে নিবেন ?

এখানে বলা হয়েছে ব্রহ্মা দুই দৈত্যের ভয়ে শ্রীহরির নাভিপদ্মে আশ্রয় নিলেন এবং মহামায়ার সাহায্য প্রার্থনা করলেন । তাহলে বোঝা যায় জগৎ সৃষ্টির আগে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়ে গেছে আর মহামায়ারও সৃষ্টি হয়ে গেছে । দৈত্যদ্বয় শ্রীহরির সঙ্গে ৫০ হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করে চলল । শ্রীহরি তো জগৎস্রষ্টা ইচ্ছা করলে মুহূর্তে এক ফুৎকারে দৈত্যদ্বয়কে ধংস করে দিতে পারতেন । ৫০ হাজার বছর সময় লাগল কি করে ?



তাহলে বোঝা যায় ৫০ হাজার বছর ধরে শ্রীহরিকে দৈত্যদ্বয় পেরেশান করে রেখেছিল অর্থাৎ বৈদিক ধর্মের স্রষ্টাও পেরেশান হন । স্রষ্টাই যখন পেরেশান তাহলে সৃষ্টির পেরেশানি দূর করবেন কি করে ?

এরপর বলা হয়েছে দৈত্যদ্বয়ের মেদ বা চর্বি থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে । পৃথিবী সৃষ্টি করতে গেলে যত পরিমান চর্বি লাগবে তত পরিমান চর্বি কি ওই দৈত্যদ্বয়ের শরীরে কি ছিল ? বিজ্ঞান কি বলে যে পৃথিবী চর্বি থেকে সৃষ্টি হয়েছে ? এটা কি বিজ্ঞান বিরোধী বক্তব্য নয় ?

এরপর এখানে বলা হয়েছে, শ্রীহরির নাভী থেকে ব্রহ্মা, হৃদয় থেকে বিষ্ণু এবং ললাট বা কপাল থেকে শিব আবির্ভূত হয় । তাহলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যদি শ্রীহরির সত্ত্বা থেকে উৎপন্ন হন তাহলে শ্রীহরিকে সৃষ্টির মূল সত্ত্ব বলে মেনে নিতে হবে । কিন্তু হিন্দু বা সনাতন বৈদিক ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করা হয় তাহলে বোঝা যায় কোথাও ব্রহ্মাকে শ্রীহরি বলা হয়েছে, কোথাও বিষ্ণুকে শ্রীহরি বলা হয়েছে, আবার কোথাও শিবকে শিবকে শ্রীহরি বলা হয়েছে । ঠিক সেই রকম হিন্দু ধর্মে মূল স্রষ্টা সম্পর্কে নানা রকম বক্তব্য রয়েছে । মূল স্রষ্টা যে কে সে সম্পর্কে তারা এখনও পর্যন্ত ঠিক করতে পারেন নি । কোথাও ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে, কোথাও বিষ্ণুকে সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে, কোথাও বাসুদেবকে সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে । যেমন,

বেদান্ত বলে : সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম । অর্থাৎ বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময় ।

উপনিষদ বলে : ধর্মবহং পপমুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম । অর্থাৎ সেই নিত্য বিশ্বাধার পরম ব্রহ্মকে নিজ আত্মাকে “আমিই ব্রহ্মের স্বরূপ” এই প্রকার “অভেদ রূপে” চিন্তা করলে জীবমুক্তি লাভ করতে পারে ।

বিষ্ণুপুরান বলে : ইদং বিষ্ণু ময়ং জগৎ । অর্থাৎ এই জগৎ বিষ্ণুময় ।

গীতা বলে : বাসুদেবঃ সর্বমিতি অর্থাৎ বাসুদেব সব কিছু বা সমস্ত ।

ভাগবত পুরাণ বলে : কৃষ্ণ মেন মবেহি ত্বং আত্মানম খিলাত্মা নাম অর্থাৎ কৃষ্ণকে অখিলাত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে, তিনিই বিশ্বাত্মা ।

অহংবাদীরা বলে : অহং ব্রহ্মং অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম বা আমিই তিনি ।

সোহংবাদীরা ও ত্রিত্ববাদীরা বলেন : ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন মিলে ‘একেশ্বর’ ।



সর্বেশ্বর বাদীরা বলেন : প্রণমেদদবৎ ভূমাবশ্বচাভাল গোখরম (ভাঃ) অর্থাৎ কুকুর, চড়াল, গো-গর্ধভ পর্যন্ত সমুদয় জীবকে (ব্রহ্মজ্ঞানে) দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ।

সুতরাং সনাতন বৈদিক হিন্দু ধর্ম মতে সবকিছুই হরি সবই ব্রহ্ম । সৃষ্টিও হরি স্রষ্টাও হরি । সেইজন্য জনৈক সর্বেশ্বরবাদী কবি ব্রহ্ম বা পরমাত্মার স্বরূপ বোঝানোর জন্য বলেছেন,

হরির উপরে হরি
হরি দেখে তায়,
হরিতে দেখিয়া হরি
হরিতে লুকাই ॥

সনাতন বৈদিক হিন্দু ধর্মের নিকট বিশ্ব ও বিশ্বনাথ বা পরমাত্মা এক ও অভিন্ন । ‘ঐ জয়িষু হিন্দুর’ নামক পুস্তকে স্বামী বেদানন্দ লিখেছেন, ইসলাম ধর্মের সিদ্ধান্ত ভগবান তাঁর সৃষ্টি জগৎ থেকে পৃথক । কিন্তু বীর্যবান হিন্দুসাধক তপস্যার বলে বিশ্ব-বৈচিত্রের অন্তরালে অবস্থিত ঐক্যকে আবিষ্কার পূর্বক সিদ্ধান্ত দিলেন--বিশ্বনাথ ও বিশ্বজগৎ এই অভিন্ন; যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ত্যাভি সংবিশন্তি তদব্রহ্ম । ভগবান হইতে ইহার উৎপত্তি, ভগবানই স্থিতি, ভগবানের মধ্যে ইহা বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে । হিন্দু ধর্ম ভিন্ন আর অন্য কোন ধর্মে এই সাধনার বীর্য, ভাব ও জ্ঞানের উচ্চতা, এরূপ উচ্চতম উপলব্ধির কল্পনাও দেখা যায় না, সাধনা তো দূরের কথা । (ঐ জয়িষু হিন্দু, পৃষ্ঠা-১৮)

বিশ্ব ও বিশ্বনাথ বা পরমাত্মা একই যদি হয় তাহলে বাঘ নামক বিশ্বনাথ কেন হরিণ নামক বিশ্বনাথকে ভক্ষণ করে ? গরু নামক বিশ্বনাথ কেন ঘাস নামক বিশ্বনাথকে হজম করে ? কুকুর নামক বিশ্বনাথ পায়খানা নামক বিশ্বনাথকে কেন উদরস্থ করে ? মানুষ নামক বিশ্বনাথ কেন গরু নামক বিশ্বনাথের গোস্তের টিকিয়া বানিয়ে হজম করে ? এক বিশ্বনাথ কে অপর বিশ্বনাথের ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে ? স্রষ্টা ও সৃষ্টি যদি এক হয় তাহলে কে এক স্রষ্টা অপর স্রষ্টার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে অক্ষম ? সুতরাং সনাতন হিন্দু ধর্ম মতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি মিলে এক গোলমেলে হ-য-র-ল-ব ব্যাপার হয়ে গেছে । তাই বিশ্ব ও বিশ্বনাথ বা পরমাত্মা একই যদি হয় তাহলে বাঘ নামক বিশ্বনাথ কেন হরিণ নামক বিশ্বনাথকে ভক্ষণ করে ? গরু নামক বিশ্বনাথ কেন ঘাস নামক বিশ্বনাথকে হজম করে ? কুকুর নামক বিশ্বনাথ পায়খানা নামক বিশ্বনাথকে কেন উদরস্থ করে ? মানুষ নামক বিশ্বনাথ কেন গরু নামক বিশ্বনাথের গোস্তের টিকিয়া বানিয়ে হজম করে ? এক বিশ্বনাথ কে অপর বিশ্বনাথের ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে ? স্রষ্টা ও সৃষ্টি যদি এক হয় তাহলে কে এক স্রষ্টা অপর স্রষ্টার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে অক্ষম ? সুতরাং সনাতন হিন্দু ধর্ম মতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি মিলে এক গোলমেলে হ-য-র-ল-ব ব্যাপার



হয়ে গেছে। তাই বিশ্ব ও বিশ্বনাথ বা পরমাত্মা একই যদি হয় তাহলে বাঘ নামক বিশ্বনাথ কেন হরিণ নামক বিশ্বনাথকে ভক্ষণ করে? গরু নামক বিশ্বনাথ কেন ঘাস নামক বিশ্বনাথকে হজম করে? কুকুর নামক বিশ্বনাথ পায়খানা নামক বিশ্বনাথকে কেন উদরস্থ করে? মানুষ নামক বিশ্বনাথ কেন গরু নামক বিশ্বনাথের গোস্তের টিকিয়া বানিয়ে হজম করে? এক বিশ্বনাথ কে অপর বিশ্বনাথের ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে? স্রষ্টা ও সৃষ্টি যদি এক হয় তাহলে কে এক স্রষ্টা অপর স্রষ্টার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে অক্ষম? সুতরাং সনাতন হিন্দু ধর্ম মতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি মিলে এক গোলমেলে হ-য-র-ল-ব ব্যাপার হয়ে গেছে। তাই সনাতন বৈদিক ধর্ম কোনদিন ঐশ্বরিক বা ইলহামী ধর্ম হতে পারে না। সনাতন বৈদিক ধর্ম কোনদিন ঐশ্বরিক বা ইলহামী ধর্ম হতে পারে না।

রামায়নের প্রতি এক কলম

ঐতিহাসিক গৌতম রায় লিখেছেন, “.....অথচ রামকথার বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিকতার বৈভব ভারতীয় সংস্কৃতির যে - কোনও পর্যবেক্ষককে চমৎকৃত করবে। বাল্মীকির ধারায় রচিত হলেও দক্ষিণের বাল্মীকি বলে মান্য কব্বনের তামিল রামকথা ‘ইরামবতারম’ সূর্যনথাকে ট্রাজিক নায়িকা, রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে ট্রাজিক নায়ক রূপে দেখিয়েছে। সম্ভবত বাল্মীকির আগে রচিত এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের আগে জনপ্রিয় বৌদ্ধ ও জৈন রামকথার কাহিনীও কম চিত্তাকর্ষক নয়। বৌদ্ধ দশরথ-জাতকে রাম সীতা পরস্পর ভাই - বোন হয়েও কলক্রমে স্বামী - স্ত্রী, যা আর্যপূর্ব এক মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পুরাণ। রাম এখানেও মহাসত্ত্ব, তাঁর বাহুবল নয়, অধ্যাত্মবলই প্রধান। এতে সীতাহরণ নেই, রাবণবধ নেই, হিংসা বা রক্তপাত নেই। চিনা রামায়ন নামে খ্যাত আরও দুটি প্রাচীন বৌদ্ধ রামকথাতেও রাম বোধিসত্ত্ব। জৈন রামকথায় আবার রাবণ নায়ক। তিনি প্রজ্ঞাবান, মহৎপ্রাণ, উদারহৃদয়, দয়ালু, তপস্বী ও জিতেন্দ্রিয়। ব্রাহ্মণরা তাঁর নামে কুৎসা ছড়িয়ে তাঁকে খলনায়ক বানিয়েছে। বিমলাসুরি জৈন রামকথা পৌমাচারিয় (সংস্কৃত পদ্যচরিত-এর প্রাকৃত) বাল্মীকি রামায়নের প্রতি পুরাণ। রাম নয়, রাবণের বংশ পরিচয়ের গুণকীর্তন দিয়েই এর শুরু। এ কাহিনীতে জৈন আত্মায় বিবর্তিত রাম নয়, লক্ষণই রাবণকে বধ করে। তাই হিংসাবিমুখ রাম কেবল্য লাভ করলেও রাবণঘাতী লক্ষণ সরাসরি নরকবাসী হয়।

অন্য এক জৈন রামকথায় সীতা রাবণের কন্যা। কর্ণাটকের লৌকিক রামকথাতেও সীতা রাবণদুহিতা, এমনকি রাবণের গর্ভ থেকেই নিঃসৃত। বাংলা চন্দ্রাবতী রামায়নও রাবণপত্নী মন্দাদরীর কন্যা রূপে সীতাকে দেখিয়েছে। এই রামকথাগুলিতে রাবণ - সীতার স্পষ্টতই ইদিপাস কাহিনীর দ্যোতক ঋদ্ধ হয়ে উঠে। শ্রীলঙ্কার একটি লৌকিক রামকথায় সীতা তাঁর অপহারক রাবণকে তাঁর সঙ্গে যৌন মিলনের জন্য তিন মাস অপেক্ষা করতে বলেন, যেহেতু ওই তিন মাস তিনি সতীত্বের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ।



কাশ্মীরের লৌকিক রামকথায় সুপ্ননখার প্রতিশোধপরায়ণ কন্যা সীতার পরিচারিকার কাজ নিয়ে অযোদ্ধাপ্রসাদে ঢোকে এবং পীড়াপীড়ি করে সীতাকে দিয়ে রাবণের ছবি আঁকায়। রামকে ঘরে ঢুকতে দেখে তড়িঘড়ি সীতা সেই ছবি বিছানার নীচে লুকিয়ে ফেলে। কিন্তু বিছানা রাবণের ভরে কাঁপতে থাকে। সন্দ্বিগ্ন রাম বিছানা তুলে রাবণের মুখাবয়ব দেখে যৌন ঈর্ষায় জ্বলে উঠে লক্ষ্মণকে নির্দেশ দেন সীতাকে হত্যা করার। সাঁওতালি রামকথায় সীতাকে রাবণ ও লক্ষ্মণের সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হতেও দেখা গেছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রামায়নে আবার রামভক্ত হনুমান নারীসঙ্গলোভী। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, লৌকিক বিশ্বাস, বিভিন্ন কৌম জনগোষ্ঠীর ধ্যানধারণা রামকথার বহুমুখী ঐতিহ্যকে পুষ্ট করেছে। এখনও পুতুল নাচে, কথকথায় লৌকিক সঙ্গীত ও নৃত্যে, নাটকে - চলচ্চিত্রে, যাত্রাপালায়, নৌটঙ্কির আসরে, জনজাতীয় নানা পরব ও লোকাচারে, পাঁচালী ও মেয়েলী ব্রতকথায় রামকথার যে বহুবর্ণ মোজাইক বিধৃত, রামায়ন তারই একটি প্রধান ধারা।” (হিন্দু সম্প্রদায়িকতা মুসলিম মৌলবাদ, পৃষ্ঠা-১৩৯ ও ১৪০)

এককথায় রামায়নে রামচন্দ্র, হনুমান, রাবণ, সীতা, লক্ষ্মণ এরা কেওই সৎপুরুষ ছিলেন না। সকলেই কামুক প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। সীতা রামচন্দ্রের বোন হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বিবাহ করেন, সীতা রাবণের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও ব্যাভিচার করার জন্য অপহরণ করেন, সীতাও তাঁর পিতা রাবণকে তিন মাস অপেক্ষা করতে বলেন যৌন মিলনের জন্য, এমনকি রাবণ নিজ কন্যা সীতার সঙ্গে ব্যাভিচারও করে, লক্ষ্মণও সীতার সঙ্গে ব্যাভিচার করে, হনুমানও নারীসঙ্গলোভী (মাগীবাজ)। সুতরাং রামায়নের কোনচরিত্রই সৎপুরুষ বা সৎনারী নয়। সকলেই চরিত্রহীন। তাই রামায়নের রামচন্দ্র কোনদিনই ভগবান হতে পারেন না। আর সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম কোনদিন ঐশ্বরিক বা ইলহামী ধর্ম হতে পারে না। রামায়ন স্বপ্নবিলাসী কবির কল্পনিক আখ্যান তো হতে পারে কিন্তু সত্য ঘটনা হতে পারে না।

শঙ্করাচার্য একেশ্বরবাদ কোথা থেকে পেলেন ?

শঙ্করাচার্য কটুর একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আর্থ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষী দয়ানন্দ সরস্বসতী তাঁরা ‘সত্যার্থ প্রকাশ’ নামক কিতাবে শঙ্করাচার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেই শঙ্করাচার্য ইসলাম থেকেই কটুর একেশ্বরবাদের তত্ত্ব পেয়েছিলেন। ঐতিহাসিক সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছেন, “অর্থাৎ মেনে নেওয়া ভাল যে শঙ্করাচার্য ইসলাম ধর্মের ভিত্তি ও বিস্তারিত বক্তব্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন।.....বহুদেব - দেবীর পূজা মিথ্যা এবং ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এ কথাটা সমগ্র ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে শঙ্করাচার্য যেমন অমোঘভাবে ঘোষণা করেন তেমনটি তাঁরা আগে ও পরে আর কেও



করেন নি । তাঁর ঐ আপোষহীন একেশ্বরবাদ ইসলাম ধর্মেরকথাই স্মরণ করিয়ে দেয় । কারণ ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এ কথা আরও বহু ধর্মে বলা হয়ে থাকলেও সে সব ধর্মের ঘোষণা নিয়ে এক ব্যাখ্যার অবকাশ আছে । কিন্তু ইসলামের একেশ্বরবাদ আর শঙ্করাচার্যের একেশ্বরবাদ এমন একাগ্র ও স্পষ্ট যে তাকে ব্যাখ্যার নামে বাক্যজানে আবৃত বা জটিল করার কোনও সুযোগ নেই । শঙ্করাচার্য ঐ সুনিশ্চিত একেশ্বরবাদ পেলেন কোথা থেকে ? সঙ্গত কারণেই সন্দেহ হয় যে এই সরল ও সুদৃঢ় একেশ্বরবাদ শঙ্করাচার্য ইসলাম হতেই পেয়েছিলেন ।.....শঙ্করাচার্য কথিত ঈশ্বরের সঙ্গে ইসলামের বর্ণিত আল্লাহর ভেদ নাই, অন্তর্নিহিত সত্যে উভয়ই এক ।”

(ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা-১২৮ ও ১২৯)

তাছাড়া ড. তারাচাঁদ বাবুও লিখেছেন,

“It may, therefore be premised without overstraining facts that, if in the development of Hindu religion in the South, any foreign elements are found which make their appearance after the 7th century and which cannot be accounted for the natural development of Hinduism itself, they may with much probability be ascribed to the influence of Islam.” (Influence of Islam on Indian Culture By Dr. Tarachand)

বেদ কি প্রথম আসমানী গ্রন্থ ?

অনেক আলেম বেদকে প্রথম আসমানী গ্রন্থ এবং কুরআন শরীফকে অন্তিম আসমানী গ্রন্থ বলেছেন । এবং তাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়কে হযরত নুহ (আঃ) এর উম্মত বলেছেন । তাঁদের যুক্তি হল যেহেতু সমস্ত যুগে সব ভাষায় এবং সব সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ নবী ও রসুল পাঠিয়েছেন সেজন্য ভারতবর্ষেও আল্লাহ নবী রসুল পাঠিয়েছেন । এবং বেদ হল প্রথম আসমানী গ্রন্থ ।

যাঁরা বেদকে প্রথম আসমানী গ্রন্থ বলে মনে করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলে মাওলানা শামস নাবীদ উসমানী । তিনি কুরআনে বর্ণিত সাবেঈন জাতিকো হিন্দুজাতি বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন । তিনি লিখেছেন,

১) সাবেঈনরা ইরাকের সেই স্থানের বাসিন্দা ছিল যেখানে ইবরাহীম (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন । ইবরাহীম (আঃ)- এর জন্মস্থান ‘উর’ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর খননকার্যের ফলে একথা প্রমাণিত হয়েছে ।



২) সাবেঈনরা গ্রন্থধারী বা আহল - কিতাব ছিল । (কুরআনে সাবেঈনদের আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা অনুমিত হয় । কেননা কুরআনে কোনও কোনও স্থানে ঐশ্বরগ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়গুলির পাশাপাশি তাদের উল্লেখ করা হয়েছে ।.....

৩) সাবেঈনরা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই) বলতেন, তবে তাঁরা ছিলে অংশীবাদী । হিন্দু ধর্মেরও মূলমন্ত্র ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’.....।

৪) সাবেঈনরা ইয়ামানের দিকে মুখ করে নামায পাঠ করতেন । (সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, ভারতীয় ধর্মাবলম্বীগণের বিশাল অংশ ইয়ামানের কূকে আবাদ ছিলেন । সেখানে ‘শ্যাম’ ও ‘হিন্দু’ নামক দুর্গ বর্তমান ।

৫) ‘সাবেঈন’ নামটি আজমী (অনারব), আরবীয় নয় । (হিন্দুরাও আরবীয় নয়/এই গ্রন্থের লেখক)

৬) সাবেঈনরা ফিরিশতা - পূজক সম্প্রদায় ছিলেন । (হিন্দু ধর্মে অসংখ্য দেবতা ও ফিরিশতার ধারণা প্রচলিত আছে । তাঁরা সেগুলির অর্চনা করেন) ।

৭) সাবেঈনরা জ্যোতিষ ও গ্রহনক্ষত্রে বিশ্বাসী । (বিশ্বের জাতিগুলির মধ্যে সম্ভবত এতখানি গ্রহ-নক্ষত্রে আগ্রহ আর কারও নেই যেমনটি রয়েছে ভারতীয় হিন্দুদের) ।

৮) সাবেঈনরা নক্ষত্রপূজক । (বিভিন্ন ধরনের নক্ষত্রের পূজা করার রেওয়াজ বর্তমান হিন্দু ধর্মের অঙ্গ)

৯) সাবেঈনরা অগ্নিপূজক । (হোম, বিবাহ, আরতি প্রভৃতি ক্ষত্রে অগ্নিপূজা করা হিন্দুধর্মে প্রচলিত রয়েছে) ।

১০) সাবেঈনরা হল জরথুষ্ট্র, ইরানী বংশোদ্ভূত । (এরাও আগুন পূজারী ছিল - হিন্দুরাও তা-ই । এরাও ছিল আর্য । এদিক থেকেই ভারতে আর্যদের আগমন ঘটেছিল) ।

১১) ধর্মীয় ভাবে দিনের মধ্যে কয়েকবার স্নানকারী । (বিশ্বের মধ্যে ধর্মীয় ভাবে স্নানের আবশ্যিকতা সম্ভবত সবচেয়ে বেশী হিন্দুধর্মে নিহিত । স্নান ব্যতিরেকে তাদের কোনও পূজা সম্পন্ন হয় না । তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে সম্মিলিত স্নানেরও ব্যবস্থা রয়েছে ।



১২) সাবের্গনরা ধর্মান্তরকারী । (এই হিন্দু জাতিই ইসলাম গ্রহণ করবে । এ কথা ইতিপূর্বে প্রমাণ করা হয়েছে) । (হিন্দু ধর্মের গোপন কথা, পৃষ্ঠা : ৩০-৩১/ বঙ্গানুবাদ-মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল কাইউম, প্রকাশনায়- লেখা প্রকাশনী, ৫৭ডি, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩)

মাওলানা শামস নাবীদ উসমানী তাঁর ‘হিন্দু ধর্মের গোপন কথা’ পুস্তকের ৫০ ৫১ পৃষ্ঠায় বেদকে প্রথম আসমানী গ্রন্থ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এবং ২৪, ২৫ ও ২৬ পৃষ্ঠায় হিন্দুদেরকে হযরত নুহ (আঃ) এর উম্মত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন । তিনি লিখেছেন,

“বিশ্বের সমস্ত ধর্মের মধ্যে সর্বসম্মতভাবে বৈদিক ধর্মই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । আর নুহ (আঃ) হলেন বিশ্বের সর্বপ্রথম বিধানদাতা প্রেরিত পুরুষ (রাসুল) ।.....সংক্ষেপে এটাই যে, যাঁকে হিন্দুরা মহানুউ (MHANUVU) নামে জানে ও মান্য করে তিনি এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব । (বন্যার) ধ্বংসকান্ডে তিনি একটি নৌকার সাহায্যে বাঁচতে পেরেছিলেন । তাতে সাত জন ঋষিও ছিল.....‘মহানুউ’ দুটি শব্দের জোড়ারূপ । ‘মহা’ নামে বড় এবং ‘নুউ’ হলেন নিঃসন্দেহে নুহ আলাইহিস সালাম ।.....

‘মার্কন্ডেয় পুরাণ ও ভাগবতে তার বিশদ বর্ণনা আছে । তাতে তামাম মানবজাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । ব্যতিক্রম ছিলেন সাত জন বিখ্যাত সাধু ঋষি । তাঁদের কথা আমি একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছি । এই সাত ঋষি একটি নৌকায় চেপে বিশ্ব বিধ্বংসী প্লাবন থেকে বেঁচে ছিলেন । এই নৌকার চালক ছিলেন খোদ বিষ্ণু (খোদা) । আর এক বিশাল ব্যক্তিত্ব রক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন । তিনি হলেন মনু । আর তাঁকে আমি অন্য জায়গায় প্রমাণ করেছি যে, তিনি নুহ (আঃ) ছাড়া অন্য কেউ নন..... আমার জানা মতে, অংশিবাদী পৌত্তলিক জাতিগুলির মধ্যে কেউই প্লাবনের এত বিস্তারিত বিবরণ দেননি । আর এই ঘটনার বর্ণনা মুসা (আঃ) এর বিশদ বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, অপর কোনও জাতির সঙ্গে নয় । হিন্দুদের গ্রন্থে বিবৃত সেই বিশদ বিবরণ যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি । আর উল্লেখ করার কথা হল - আমরা এই সাক্ষ্য সেই জাতির মধ্যে পেয়েছি যার প্রাচীনত্বে সবাই একমত।

নুহ (আঃ)-এর মহাপ্লাবনের ঘটনা অত্যন্ত বিস্তৃত ভাবে ভবিষ্য পুরাণ ও মৎস পুরাণেও উল্লিখিত হয়েছে । পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমি তার উদ্ধৃতি পেশ করব ।

হিন্দুদের একাধিক ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে ‘মনু’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । তবে পুরাণ, বেদ ও অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থে সর্বাধিক বিশদভাবে যে ‘মনু’-র কথা আলোচিত হয়েছে তিনি নুহ (আঃ) । বেদ পুরাণেও নুহ (আঃ)-এর বিশদ বিবরণ ছাড়াও ওই



সম্প্রদায় ও নুহ (আঃ)-এর সম্পর্ক বিষয়ক অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আমি তুলে ধরছি।” (পৃষ্ঠা : ২৪-২৫)

সুতরাং বেদকে প্রথম আসমানী গ্রন্থ ও হিন্দুদেরকে হযরত নুহ (আঃ) এর উম্মত বলা হয়েছে।

এখানে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে এর আগে যে বলা হয়েছে ঐতিহাসিক বি. আর্যের গবেষণা অনুযায়ী বেদ যদি ইংরেজদের চক্রান্তে সৃষ্টি হয় তাহলে তা প্রথম আসমানী বা ইলহামী গ্রন্থ হল কি করে ?

এর উত্তর হল, ভারতবর্ষে কোন ধর্মগ্রন্থ একেবারেই ছিল না এমনটা নয়। ধর্ম থাকলে তার কিছু গ্রন্থাবলী অবশ্যই থাকবে। হতে পারে অন্য কোন ভাষায় প্রাচীন কিছু পুঁথি চক্রান্তকারীদের হাতে ছিল বা বিভিন্ন পুরাণ থেকে এবং বিভিন্ন বহুভারতীয় ধর্মগ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁরা বেদকে রচনা করেন। তবে সংস্কৃত বেদ ইংরেজদের আগমনের আগে এদেশে ছিল না।

আর একান্তই যদি তর্কের খাতিরে শ্রী বি. আর্যের গবেষণাকে ভুল বলে মেনে নেওয়াও যায় তাহলে একথা সুনিশ্চিত যে, যে বেদ বর্তমানে আমাদের কাছে আছে তা ঐশ্বরিক বা ইলহামী গ্রন্থ হতে পারে না। কেননা এর মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। যেমন, দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন,

ঋগ্বেদের ২১ টি শাখা ছিল। বর্তমানে মাত্র ৫টি শাখা রয়েছে।

সামবেদের ১০ টি শাখা ছিল। বর্তমানে মাত্র ৮টি শাখা রয়েছে।

যজুর্বেদের ৮৬ বা ১০০ টি শাখা ছিল। বর্তমানে মাত্র ২টি শাখা রয়েছে।

অথর্ববেদের ১২,৩৩৩টি সূক্ত ছিল। বর্তমানে মাত্র ৫,৮৩৩টি সূক্ত রয়েছে।

(পৃথিবীর ইতিহাস)

সুতরাং বেদকে যদি প্রথম আসমানী গ্রন্থ বলে মেনেও নেওয়া যায় তাহলেও এখানে দেখা যাচ্ছে যে বেদের মধ্যে কি পরিমান পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হয়েছে। আর যে ধর্মগ্রন্থের মধ্যে মানুষ দ্বারা পরিবর্তন হয় তা আর ঐশ্বরিক বা ইলহামী গ্রন্থ থাকে না। যেমন কুরআন শরীফে মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, “হে নবীগণ! পবিত্র দ্রব্য আহ্বার করুন এবং সৎকার্য করুন। আপনারা মূলতঃ একই দলভুক্ত আর আমি আপনাদের প্রভূ। সুতরাং আপনারা আমাকে ভয় করে চলুন। কিন্তু পরবর্তী কালে



মানুষেরা পরস্পরে মতানৈক্য করে নিজেদের ধর্মকে পৃথক পৃথক করে নিয়েছে এবং তাতেই তারা পরিতুষ্ট (বোধ করছে) । (সূরা মু'মিনুন, আয়াত-৫১, ৫২, ৫৩)

সুতরাং বেদের মধ্যেও প্রচুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে । সেজন্য বেদ আসমানী গ্রন্থ আর থাকতেই পারে না । যে ধর্মগ্রন্থে সামান্য পরিবর্তন মানুষ করে ফেলে তখন সে আর আসমানী গ্রন্থ থাকতেই পারে না । আর বেদের রচনাকাল বলা হয়েছে ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৩২০০ বছর আগে বেদের রচনাকাল । সুতরাং এই ৩২০০ বছরের মধ্যে বেদ কি বিপুল পরিমাণে পরিবর্তন হয়েছে তা বলা অসম্ভব । আর ইংরেজদের চক্রান্তে তো বেদকে পুরোপুরি ভাবে বিকৃতি করে দেওয়া হয়েছে ।

একটি অভিযোগের জবাব

মহেন্দ্রপাল আর্ষ সহ কিছু হিন্দু পণ্ডিত অভিযোগ করেছেন যে বেদ যদি প্রথম আসমানী গ্রন্থ হয় তাহলে আল্লাহ কুরআন কেন অবতীর্ণ করলেন ? কারণ আল্লাহর জ্ঞান তো পূর্ণ । তাহলে বেদের মধ্যে কি এমন অপূর্ণ কথা আছে যে আল্লাহ তা পূর্ণ করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ করলেন ? উদাহরণস্বরূপ মহেন্দ্রপাল আর্ষ বলেন, কোন বই লেখার পর প্রথম সংস্করণে ভুল থাকলে পরের সংস্করণে তা সংশোধন করে নেওয়া হয় । কিন্তু বেদের মধ্যে কি এমন ভুল ছিল যে আল্লাহ তা সংশোধন করার জন্য কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করলেন ?

এর উত্তর হল, বর্তমানে যে বেদ আমাদের কাছে আছে তা আসমানী গ্রন্থ নয় । কেননা এর মধ্যে প্রচুর বৈজ্ঞানিক ভুল রয়েছে যা এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে । সুতরাং এটাকে ঐশ্বরিক বা আসমানী গ্রন্থ বলে মেনে নেওয়া যায় না কারণ, আল্লাহ হলেন সৃষ্টিকর্তা । আল্লাহ সৃষ্টি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন । তিনি ভুল করতে পারেন না । যেহেতু বেদের মধ্যে অনেক ভুল রয়েছে সেজন্য বেদ ঐশ্বরিক বা আসমানী গ্রন্থ হতে পারে না । আর বেদকে যদি আসমানী গ্রন্থ বলে মেনে নেওয়াও হয় তাহলেও দেখা যায় এর মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে । সেজন্যই আল্লাহ পাক বলেছেন, “হে নবীগণ ! পবিত্র দ্রব্য আহার করুন এবং সংকার্য করুন । আপনারা মূলতঃ একই দলভুক্ত আর আমি আপনাদের প্রভু । সুতরাং আপনারা আমাকে ভয় করে চলুন । কিন্তু পরবর্তী কালে মানুষেরা পরস্পরে মতানৈক্য করে নিজেদের ধর্মকে পৃথক পৃথক করে নিয়েছে এবং তাতেই তারা পরিতুষ্ট (বোধ করছে) । (সূরা মু'মিনুন, আয়াত-৫১, ৫২, ৫৩)

এখানে আল্লাহ পরিষ্কার বলছেন যে একটাই ধর্ম তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন মানুষ সেগুলিকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। সেজন্যই আল্লাহ তারপর জবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেন। এগুলোতেও মানুষ নিজেদের মনগড়া মতবাদ ঢুকিয়ে দেয় এবং খ্রীষ্টান ও ইহুদীরা বলে যে হযরত ইসা (আঃ) ও হযরত উজাইর (আঃ) আল্লাহর পুত্র। ফলে আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেন। আর কুরআনে কোনরকম পরিবর্তন পরিবর্ধন কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ করতে পারবে না কারণ কুরআনের হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং নিয়েছেন।

মহেন্দ্রপাল আর্ষ ও অন্যান্য হিন্দু পণ্ডিতদের বোঝা উচিত ছিল আল্লাহর জ্ঞান পূর্ণ তাই প্রথমে বেদ, বাইবেল (ইঞ্জিল), যবুর বা তৌরাত অবতীর্ণ হওয়ার সময় কোন ভুল ছিল না। মানুষ পরিবর্তন করে দিয়েছে সেজন্য আল্লাহ সংস্করণ করে কুরআন নাম দিয়ে আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ করেন।

পরিশিষ্ট

প্রিয় পাঠক ! এতক্ষণ দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরে গেলেন হিন্দু ধর্ম কোন ধর্মই নয়। আর বেদও আল্লাহর বানী নয়। মানুষের দ্বারা লিখিত একটি সাধারণ গ্রন্থ মাত্র। এর মধ্যে প্রচুর বৈজ্ঞানিক ভুল রয়েছে। অশ্লীল কথাবার্তা লেখা রয়েছে। পিতার সঙ্গে কন্যার, ভাইয়ের সঙ্গে বোনের অবৈধ সম্পর্কের কথা লেখা রয়েছে। এবং সেই অবৈধ সম্পর্ক দেবতাদের মধ্যেই ছিল। তাদের কোন দেবতাই চরিত্রবান ছিলেন না। সব দেবতাই চরিত্রহীন লম্পট, ধর্ষক, কামুক প্রকৃতির ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র থেকে শুরু করে রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, লক্ষ্মণ, ব্রহ্মা, শিব, মিত্র, বরুণ, সূর্য, চন্দ্র, বৃহস্পতি, পবনদেব, প্রজাপতি, সীতা, রাধা, কেউই সৎচরিত্রের অধিকারী ছিলেন না। সকলেই কিছু না কিছু অশ্লীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন।

হিন্দু গ্রন্থগুলি পাঠ করলে দেখা যায় হিন্দুরা যেসব দেবতার পূজা করেন তাদের থেকে দেবতাদের বিরোধী অসুররাই সৎচরিত্রের অধিকারী ছিল। কারণ তারা স্বর্গলোক অর্জন করার জন্য দেবতাদের মতো ছল চাতুরতার আশ্রয় নেয়নি। তারা বীরের মতো যুদ্ধ করে মারা গেছে। আর দেবতারা স্বর্গলোক অর্জন করার জন্য অসুরদের পিছনে সুন্দরী মহিলা পাঠিয়ে ধ্যানভঙ্গ করে অসুরদের দের ঠকিয়েছে। আর যেসব সুন্দরী অমরদেরকে দেবতারা অসুরদের ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য পাঠাতো তাদের সঙ্গে দেবতাদের করো অবৈধ সম্পর্ক ছিল আবার কেউ দেবতাদের স্ত্রী ছিলেন। অর্থাৎ দেবতারা স্বর্গলোক অর্জন করার জন্য নিজের মা, বোন, স্ত্রী এমনকি রক্ষিতাদেরকেও অবৈধ কাজে ব্যবহার করত। এমনকি স্বর্গীয় বেশ্যা উর্বশীকেও তারা ব্যবহার করত।



এই হল হিন্দুধর্মের দেবতাদের চরিত্র । যাদেরকে হিন্দুরা মন্দিরে মন্দিরে মূর্তি বানিয়ে পূজা-অর্চনা করে ।

যে হিন্দু সনাতন বৈদিক ধর্ম এত জঘন্য সেই বৈদিক ধর্মের মহেন্দ্রপাল আর্ষ আমাদেরকে মুনাযারার (বিতর্ক) চ্যালেঞ্জ করে ! ভাবতেও অবাক লাগে ।

হিন্দু পাঠকদের বলি ! আপনারা কিছু মনে করবেন না যে আমি হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে এত কটর ভাবে লিখেছি । কেননা বেইমানের সরদার ও শয়তানের অনুসারী কাজ্জাব মহেন্দ্রপাল আর্ষ যদি আমাদের কুরআন শরীফের বিরুদ্ধে হামলা না করত তাহলে আমিও এই পুস্তক রচনা করতাম না । ইট ছুঁড়লে তো পাটকেল খেতেই হবে ।

পলটকর দেখো জালিম তামান্না হম ভি রাখতে হাঁয়,

অগর তু সঙ্গে মর্ময় হায় তো পখর হম ভি রাখতে হাঁয় ।

মহেন্দ্রপাল আর্ষের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

আর্ষ সমাজের সদস্য পণ্ডিত আমাকে এবং সমগ্র মুসলমান জাতিকে মুনাযারার (বিতর্কের) চ্যালেঞ্জ করেছেন যে যদি কুরআন শরীফকে ঐশ্বরিক বা ইলহামী গ্রন্থ বলে প্রমাণ করে দিতে পারে তাহলে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিবেন ।

আমি তাঁর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম । তিনি যে কোন সময় আমাদের সঙ্গে মুনাযারা করতে পারেন । ইনশাআল্লাহ প্রমাণ করে দেওয়া হবে কুরআন ইলহামী বা ঐশ্বরিক গ্রন্থ । মহান আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ করেছেন ।

এর আগে আমি মহেন্দ্রপাল আর্ষের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি কিন্তু সে আসেনি । যদি মহেন্দ্রপাল নিজের দাবীতে সত্যবাদী হয় এবং সে যদি ধোকাবাজ কাজ্জাব না হয় তাহলে সে বাহানা না করে সে মুনাযারা করে দেখিয়ে দিক সে সত্যবাদী ।

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

পশ্চিম বঙ্গ, জেলাঃ- বীরভূম, ভারত

মোবাইল-+৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১/

+৯১ ৮৯২৬১৯৯৪১০



লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে । (অফ লাইন)
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ? (অফ লাইন)
৩. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ? (অফ লাইন)
৪. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ । (অফ লাইন)
৫. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ ।
(৮ রাকআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকআত
তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ) (অন লাইন/অফ লাইন)
৬. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের
অপবাদ ও তার খন্ডন । (অন লাইন)
৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় । (অন লাইন)
৮. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান । (অন লাইন)
৯. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ? (প্রকাশিতব্য)
১০. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ । (প্রকাশিতব্য)
১১. আমরা সবাই মৌলবাদী । (প্রকাশিতব্য)
১২. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা । (প্রকাশিতব্য)
১৩. আমরা সবাই তালিবান । (প্রকাশিতব্য)
১৪. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ? (প্রকাশিতব্য)
১৫. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী । (প্রকাশিতব্য)
১৬. মাসআলা আমীন বিল জেহের । (অন লাইন)
১৭. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম ।
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)
১৮. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন । (প্রকাশিতব্য)
১৯. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত । (প্রকাশিতব্য)
২০. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক । (প্রকাশিতব্য)
২১. আকিদা হয়াতুন নবী (সা:) (প্রকাশিতব্য)
২২. বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অন লাইন)
২৩. আসুন সন্ধাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে আমরা খতম করি । (অন লাইন)

অনুদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দু লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত
আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]
২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দু লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]



Islamic Da'wah and Education Academy



Islamic Da'wah and Education Academy

Contact-
Ashik Iqbal

Mob- 7501879668

Ph. No-01776564817

email-

iqbal86@gmail.com

islamicdawahandedu@gmail.com

www.facebook.com/2014idea

**Preaching authentic Islamic Knowledge
in the light of our pious-predecessors**

Address- Mayureswar, Birbhum-731218, W.B., India

Islamic Da'wah and Education Academy